জামশেদ মুস্তফির হাড়
সেবা
প্রকাশনী
আবদুল হাই মিনার

অতিপ্রাকৃত, রোমাঞ্চকর, ভুতুড়ে গল্পের
অভিনব সংকলন

জামশেদ মুস্তফির হাড়

আবদুল হাই মিনার

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আসাদুজ্জামান

মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং-৮৫০

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

JAMSHED MUSTOFIR HAR
By : Abdul Hye Minar

আবদার, তোকে

সূচিপত্র

ভূতুড়ে ইস্টিশন

ফেব্রুয়ারির হু হু হাওয়ার দুপুর। নির্জন দানাঙ্গাম-সড়কের ওপর হঠাৎ একটা অদ্ভুত লোককে দেখা গেলো। লোকটা সরু আর তাল-ঢেঙা। গুড়ের রঙের ঢোলা লং প্যান্ট পরেছে ও। গায়ে সবুজ স্যালিস। খগোলের রেঁায়াঅলা ফ্ল্যাট স্যাণ্ডেল।

প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে শিস দিতে দিতে দানাঙ্গামের সুন-সান সড়ক ধরে হেঁটে আসছে ও। ডুংরির পাহাড়ী বন পেরিয়ে ছোট্ট রাস্তাটা যেখানে কুমুপাহাড়ের দিকে উঠে গেছে, সেখানে খুব হেলা-ফেলায় দাঁড়িয়ে আছে এক ন্যাড়া টিলা। দানাঙ্গামের সাদা বালু-ঢাকা পথটা এই টিলার বাঁক ঘুরে বেরিয়ে এসেছে গড়দুয়ারের বাস-স্ট্যাণ্ড অব্দি। বাসস্ট্যাণ্ডে এসে পথটা দু'ভাগ হয়ে দুদিকে হারিয়ে গেছে। একটা পথ গেছে গড়দুয়ারের বাজার ঘুরে পলাশগড়ের দিকে, আরেকটা শোহানীর পাহাড়ী শহরে। লোকটা গড়দুয়ারের বাসস্ট্যাণ্ডে এসে বড়ো শিরীষ গাছটার ছায়ায় একটুখানি দাঁড়ালো।

ইরানী তার লাল সাইকেল হাঁকিয়ে এদিকেই আসছিলো। পলাশগড় থেকে ফিরছে। বাস্কেটে একগাদা গল্পের বই। অলস মন্থর পায়ে প্যাডেল ঘোরাচ্ছে। কুমুপাহাড়ের ঢালুতে মরা ঘাসের বন, দুয়েকটা তেজপাতা গাছ। ওখানে বুলবুলি শিস দিয়ে উঠছে। ইরানী গুনগুন করে গাইছে, কোন্ সুরের মাতন উঠলো দুলে ফুলে ফুলে ও চাঁপা ও করবী, কে সাজালে রঙিন সাজে জানি না যে— উঁচু নিচু পথে সাইকেল চালিয়ে সুর ঠিকমত আসে না, কেমন থেমে

থেমে যায়, মনে হয় মাতালের গান। ইরানী হেসে ফেলে ফিক করে। বুলবুলির শিসের সাথে সুর মিলিয়ে ও-ও শিস দিয়ে ওঠে। গড়ডুয়ারের বাসস্ট্যাণ্ডের কাছাকাছি এসে পড়েছে। বাসস্ট্যাণ্ড এখন একদম ফাঁকা। শুধু দু'টো অটোরিক্সা স্ট্যাণ্ড থেকে একটু দূরে একটা জারুলগাছের ছায়ায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আরেকটু দূরে বড় শিরীষের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে একটা অদ্ভুত লোক।

লোকটাকে দেখে চমকে ওঠে ইরানী। ঠিক ভয় অবশ্যি নয়, তবু গা-টা কেমন শিরশিরিয়ে ওঠে। ও বিড়বিড় করে বলে, ছোটে-কামরা, ছোটে-কামরা। তারপরই অস্বস্তিতে ঘামতে শুরু করে। লোকটা হাত উঠিয়ে ওকে ডাকে, 'এই যে দিদিভাই, শোনো।'

রাস্তার ধারের একটা বড়ো পাথরে পা নামিয়ে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ে ও। সাইকেল থেকে নামে না। লোকটা লম্বা লম্বা পা ফেলে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ফেব্রুয়ারির হু হু হাওয়ায় ইরানীর মাথার চুল উড়ছে, গালের ওপর আছড়ে পড়ছে। লোকটা ওর কাছাকাছি এসে মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'ভাই, মৌবন স্টেশনটা এখান থেকে কতদূর বলতে পারো?'

ইরানী অস্ফুটে বলে, 'আপনি মৌবন স্টেশন খুঁজছেন! এখানে, আশেপাশে একশো দেড়শো মাইলের ভেতর কোন রেললাইনই নেই, স্টেশন পাবেন কোথায়।'

লোকটা ব্যাকুলভাবে মাথা হেলায়, 'আছে, আছে। আগে-চলার পর শেষ স্টপেজ এই মৌবন। খুবই শান্ত নিরিবিলি স্টেশন। বিশাল সব শিরীষ-করুই আর অশথ গাছে কেমন ছায়া ছায়া জায়-গাটা, লোকে মৌবনই বলে, খুব মহুয়াগাছ কিনা।'

'তা-ই! মৌবন স্টেশন কোথায়, আমি বলতে পারছি না।

আপনি না হয় অন্য কাউকে—'

'উঁহু'।' লোকটা আবার বলে, 'কেউ বলতে পারলো না, আমি আটকা পড়ে গেছি, দিদিভাই। অনেকদিন ধরে আমি এই স্টেশনটা খুঁজে বেড়াচ্ছি। এটা গড়ডুয়ার না? কেউ কেউ বলেছিলো গড়ডুয়ারের আশেপাশে খোঁজ কোরো, পাবে।'

ভীষণ কৌতূহল বোধ করে ইরানী। ভুরু বাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

লোকটা হাসলো। ঝক্‌ঝকে দাঁত দেখা গেলো। প্যান্টের পকেট থেকে বাঁ হাতটা বের করে কাঁধের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে দানাগ্রামের সড়কের ওপর প্রসারিত করে বললো, 'ওই ওদিক—ছোটে-কামরা থেকে।

ইরানী ভাবলো ছোটে-কামরা বলে কোন জায়গা আদৌ কী আছে? নেই। হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়ে যায় তার। নিঃশব্দে ঘামতে শুরু করে। একটু আগেই ছোটে-কামরা শব্দটা উচ্চারণ করেছে সে। কেন? মনে পড়ছে সব। ছোটে-কামরা বলে কোন জায়গা বাস্তবে নেই। তবে পুরনো একটা গল্প চালু আছে বটে, ছোটে-কামরা মৌবন-টন নিয়ে। সেই ক্ষীয়মাণ ভূতুড়ে ইস্টিশনের গল্প। অনেক আগে এখানে ছোটোগাড়ির ক'টা ইস্টিশন ছিলো, সেই ক-বে; এখন সেগুলোর নাম নিশানাও নেই। বছর বছর রেল-কোম্পানী ক্ষতির স্বীকার হয়ে শেষে এসব পাহাড়ী লাইনগুলো বন্ধ করে দেয়। আগে এদিকে লোকবসতি ছিলোনা মোটেই। দূরের কতগুলো চা-বাগানের জন্যে ইংরেজ সাহেবদের বানানো এই রেললাইন। চা-বাগানগুলো এখনো আছে। রেললাইন উঠে যাওয়ার পর, দাংরির কাঁচা সড়ক দিয়েই তারা ট্রাকে করে চা চালান

দেয়।

সময়ের চাকায় দিন-মাস-বরষ পেরিয়ে গেছে অনেক। তিরিশ বছর পর, হঠাৎ একদিন পলাশগড়ের লোকজন অবাক হয়ে শোনে : সেই মন-কেমন-করা টানা টানা হুইসেলের শব্দ—রেলগাড়ির কু-ঝিক্ঝিক্ আওয়াজ। কেউ কেউ নাকি ছায়া ছায়া নিরিবিলি একটা স্টেশনও দেখতে পেয়েছিলো—ভেসে উঠেই আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেছে তাদের চোখের সামনে থেকে। স্পষ্টই তারা দেখতে পেয়েছিলো সেই সব বিশাল বন-তেঁতুলের গাছ, শিরীষ আর করুই-এর গাছ— তারই ছায়ায় নিরিবিলি লালবাড়ির ইস্টিশন, ছাইছাই গুমটি -ঘর, খাকি প্যান্ট-শার্ট পরা একটা সরু ছোট্ট লোক আস্তে আস্তে ঘন্টি বাজাচ্ছে, নীল উর্দি-পরা একজন গার্ডবাবু আরেকজন মোটা-সোটা লোকের সাথে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছে। একটা নেড়ী কুকুর অলস মন্থর পায়ে হেঁটে হেঁটে গুমটি-ঘরের দিকে চলেছে। পনেরো-ষোলজন যাত্রী এলোমেলোভাবে ইস্টিশনের ছোট্ট প্ল্যাটফর্মের সামনে বিপন্ন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কেউ কথা বলছে মৃদু বিষণ্ণ গলায়। ঠিক এ সময় সিটি বাজিয়ে তিনগাড়ির ছোট্ট একখানা ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মে ঢুকলো। ছায়া ছায়া নিরিবিলি স্টেশনটা এ সময়ই আস্তে আস্তে তাদের চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যায়।

এই ভূতুড়ে ব্যাপার নিয়ে তখন বেশ একটা হৈ-চৈ হয়েছিলো—পলাশগড়, শোহানী আর গড়দুয়ারের লোকজনদের মাঝে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। স্টেশনটাকে না দেখলেও অনেকেই ট্রেনের হুইসেল শুনেছে। কানকে কী অবিশ্বাস করা যায়? ব্যাপারটার কোন ব্যাখ্যাই খুঁজে পাওয়া যায়নি। অনেকে বললেন এটা অডিটরী আর ভিস্যুয়াল হেলুসিনেশান। কিন্তু তারপর দু'বছর যেতে না যেতেই আবার

সেই ট্রেনের হুইসেল। এবার, গড়দুয়ারের উত্তরের শাল বনের ওদিক থেকে ভেসে এলো রেলগাড়ির কু-ঝিক্‌ঝিক্‌ শব্দ। তবে এইবার কেউ সেই ভূতুড়ে ইস্টিশনটাকে চোখে দেখেনি। তারপর থেকেই মাঝে মাঝে কেউ কেউ নাকি এই ভূতুড়ে ট্রেনের আওয়াজ শুনেছে, স্টেশনটাকেও দেখেছে।

সবই এখন গল্প-গাঁথা। সত্তর বছরের পুরনো এ-গল্প। ইরানীর খুব ভালো লেগেছিলো। গল্পটা প্রথম শোনার পর তার ভাইয়া আরশাদ মাহমুদ, বান্ধবী বিলু, মানে বিলকিস তাসনিয়া, ছোটমামা বিগনু আর আইরিন আপা, টুকু আর রাহী—এরা সবাই মিলে একটা অনুসন্ধান কমিটিও গঠন করেছিলো। টানা একমাস আশপাশের লোকজনদের জেরা করে করে নাস্তানাবুদ করে, সমস্ত এলাকা পরিদর্শন করে শেষে একদিন বিগনুমামা আর আইরিন আপা ঘোষণা করলো, সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই বোগাস্‌—রাম-বোগাস্‌ যাকে বলে। অবিশ্বাস্য এক ভূতুড়ে কেচ্ছা এটা।

সেই অস্বস্তিকর ভাবটা এখন আর নেই। ইরানী স্নিগ্ধ হেসে আগন্তুক লোকটার মুখের দিকে তাকায়। হেসে বলে, 'আপনি তো সত্তর-আশি বছর আগের কথা বলছেন, ছোটে-কামরার ইস্টিশন যৌবন তো বেশ অনেক অনেক বছর আগের ঘটনা। এখন অই নামগুলো নিছক গল্প। আপনি কি সেই গল্পের কথাই বলছেন?'

আগন্তুক কথা বললো না। ধ্যানী ঋষিদের মতন অনড় হয়ে কতোক্ষণ দূরে কুমুপাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। উদাস হাসি ফুটে উঠলো ঠোঁটের কোণে। তারপর আস্তে আস্তে ডান হাতটা প্রসারিত করে পাহাড়ের ঢালানের দিকটা দেখিয়ে ইরানীকে বললো, 'ওই যে, দেখো।'

দেখতে হয়না, তার আগেই ইরানীর কানে ভেসে আসে সেই মন-কেমন-করা টানা টানা হুইসেলের শব্দ। কু-ঝিক্‌ঝিক্‌ আওয়াজ। ইরানী ভয় পায় না, শুধু মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। বুকের ভেতরটা ধক্‌ করে ওঠে। তাহলে সবই সত্যি! আস্তে আস্তে মাথা হেলিয়ে তাকায় ও। স্পষ্টই চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রাচীন এক ইস্টিশন—ছায়া ছায়া আর ভীষণ নিরিবিলি। বড় বড় অশ্বথ আর বন-তেঁতুলের গাছে কেমন আঁধার আঁধার ছোট্ট প্ল্যাটফর্ম। অলস মন্থর পায়ে লোকজন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। কথা বলছে। শালপাতার ঠোঙায় ছোলা-ভুনা বিক্রি হচ্ছে, মাটির ভাঁড়ে কেউ কেউ চা খাচ্ছে। প্রাচীন শেওলা ধরা এক নিস্তব্ধতা সেখানে। ইরানী মন্ত্রমুগ্ধের মত সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

লোকটা ইরানীর মাথায় হাত রেখে বলে, 'চলি, দিদিভাই!' বলেই লম্বা লম্বা পা ফেলে শিস দিতে দিতে ছায়া ছায়া স্টেশনটার দিকে এগিয়ে যায় সে। যেতে যেতে একবার ইরানীর দিকে হাতনাড়ে। ইরানীও হাত নাড়ে প্রত্যুত্তরে। লোকটা স্টেশনের ভেতর ঢুকে পড়ে। ঠিক এসময় সারা স্টেশনটা দুলে ওঠে, তারপর আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে থাকে ইরানীর চোখের সামনে থেকে।

ঘোর-লাগা চোখে অনেকক্ষণ ফাঁকা বনের দিকে তাকিয়ে থাকে ইরানী। লোকটা কী স্বপ্ন, না সত্যি! স্টেশনটা?

জামশেদ মুস্তাফির হাড়

[পঁচিশ বছর ধরে জামশেদ মুস্তফির পেছন পেছন ছায়ার মতোন ঘুরে বেড়াচ্ছে কুটি কবিরাজ। কেন?]

অনন্তপুর। ১ মার্চ।

চন্দ্রানী হোটেলটা নিজ্‌ঝুম পাহাড়ের গায়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা এক নিঃসঙ্গ বাংলোবাড়ির কাঠামোয় ততোধিক নিঃসঙ্গ এক অপ-চ্ছায়া যেন। কাল দুপুরের দিকে অনন্তপুরের এই পাহাড়ী শহরে এসে পৌঁচেছি। জায়গাটা ভারি সুন্দর সীতাশ্রী আর রামগড়ের পর উত্তরের এই আধাশহর আধাজঙ্গল এলাকাটা সী-লেভেল থেকে দেড় হাজার ফুট উঁচুতে। সারা দিনমান এখানে শোঁ শোঁ হাওয়া বয়। সকালের দিকে আর দুপুরের দিকে ঝরাপাতার বনে এক ঝাঁক আনন্দের প্রজাপতি যেন একঝাঁক বেদিশা ফুর্তির ঘূর্ণি হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

অনন্তপুরে শালের জঙ্গল খুব বেশি, নিরেট সাদা ধড়ের আর ঝিরিঝিরি পাতার ইউক্যালিপ্টাসগুলোও বড়ো একটা কম নয়। এখানে যে ব্যাপারটা কম, তা হচ্ছে লোকজনের বসত-বস্তি। আড়াই বর্গমাইলের এই পাহাড়ী শহরের লোকসংখ্যা মাত্র তিন-শো। ছোট্ট একটা নদী আছে, নাম দুধিয়া। পানি কিন্তু মোটেই দুধের মতো নয়, তবে স্বাদু। খেলে প্রাণ তৃপ্ত হয়।

এই নিজ্‌ঝুম হোটেলটা আমার পছন্দ হয়নি। রুম পেয়েছি

খোলামেলা, তিনদিকে জানালা, রুমের ভেতর ফক্‌ফকে সাদা চাদরের বিছানা পাতা। খোলা জানালা দিয়ে হাওয়া খেলে হু হু করে। তবু জায়গাটা কেমন যেন। গতকাল এগারোটা চল্লিশে এই হোটেলে এসে উঠি। এখন বাজছে বারোটা চল্লিশ। এই পঁচিশ ঘন্টার ভেতরই হাঁপিয়ে উঠেছি, কেন জানি বুকের ভেতরটায় খাঁ খাঁ করছে। সামনেই কী কোন অমঙ্গল ওঁৎ পেতে আছে?

হতভাগা কুটি কবিরাজের সেই বিচিত্র চিঠিটাই যতো অনর্থের মূল। বুকটা আবার খাঁ খাঁ করে ওঠে। গলা শুকিয়ে কাঠ। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ি। বাথরুমে ঢুকে কল খুলে ঢক্‌ঢক করে এক গেলাস ঠাণ্ডা পানি খেয়ে একটা লম্বা শ্বাস ফেলি। এতোক্ষণে বেশ আরাম লাগছে।

ডায়েরীর পাতা খুলে বসার আগে বিছানায় পা ছড়িয়ে যুত হয়ে বসে একটা ক্যাপস্টান ধরালাম।

কুটি কবিরাজ কে?

কুটি কবিরাজ আমার বন্ধু, বাল্যবন্ধু। ভুবনমোহিনী-তারাদাস পাঠশালায় আমরা একসাথে তৃতীয়ভাগ পর্যন্ত পড়েছি। কুটির দৌড় মাইনরতক। এরপরই ও বাপের কবিরাজী ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। বাপ ছিলেন আয়ুর্বেদী শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি, তখনকার সময়ের কলিকাতার এম. বি. পাস ডাক্তার আর ডিব্রুগড়-ফেরত ঝানু কম্পাউণ্ডাররাও কুটির বাপের সামনে পড়লে কেঁচো বনে যেতেন। কুটি পড়াশোনা করেনি ঠিকই, কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেলো বাপের মগজের খানিকটা তার মগজেও বর্তেছে। বাপের অবর্তমানে ও-ও হয়ে উঠেছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবিরাজ।

প্রথমে ওর চেম্বার ছিলো সিলেটের করিমগঞ্জে। দশ বছর পর

সেটা স্থানান্তরিত হলো শিলং-এ। তার বারো বছর পর বীরভূমের সীতা-বাড়িতে।

এই, মাত্র দু'বছর আগে কুটি কবিরাজের শেষ জায়গা বদলের খবর পাই। এখন আছে ও অনন্তপুরে। হতভাগার মাথায় ছিট আছে নির্ঘাত, নইলে একটা জায়গায় একটু জমিয়ে বসতে না বস-তেই হুট্ করে আবার আরেক জায়গায় চলে যাওয়া কেন? বিয়ে-শাদি করেনি বলেই কি? করিমগঞ্জ থেকে শিলং চলে যাওয়ার পর তার সাথে আমার আর দেখা হয়নি। তিনমাসে ছ'মাসে কুটি চিঠি লিখতো। সে চিঠিতে তার ঠিকানা দেয়া থাকতো। প্রথম প্রথম চিঠিগুলোতে থাকতো ভালোমন্দ জিজ্ঞাসাবাদ, শারীরিক কুশ-লাদি, বাজারদর, রাজনীতির হালচাল ইত্যাদি। চিঠির ভাষাও থাকতো হালকা, তুই-তোকারির।

বয়েস বাড়ার সাথে সাথে ওর চিঠির ভাষাতে বেশ একটা ভার-ভারিক্কি চাল লক্ষ্য করতে থাকলাম। আগে লিখত 'বন্ধু তুলু, কেমন আছিস? অনেকদিন পর তোর কাছে লিখতে বসে নিজেকে…' এরকম ছিলো চিঠির ভাষা, এখন সেটা দাঁড়িয়েছে—'ভায়া তুলু, আমার হৃদয় নির্গলিত ভালোবাসা জানিবায়। অনেকদিন যাবত তোমার কুশল খবর না পাইয়া বড়ই অস্বস্তিতে কালাতিপাত…।'

আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছি, ইদানীংকালের ওর চিঠি-গুলোতে বিচিত্র সব ঘটনার বর্ণনা থাকে, যা সত্যিকার অর্থেই বিচিত্র। ঘটনা বর্ণনার শেষে প্রশ্ন থাকবে—'তোমার কী মনে হয়?' '…কোনরূপ সন্দেহ করিতেছো কী?' অথবা,—'এই ব্যাপারে তোমার নিকট হইতে একটি বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা আশা করিতেছি।' '…তুমি কী এই অতীব আশ্চর্য ঘটনার কোন যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দর্শাইতে পারো

না ? আমার তো মনে হয় তোমার দ্বারাই ইহার ব্যাখ্যা সম্ভব।'

বছর তিনেক আগে সীতা-বাড়িতে থাকতে কুটি একটা চিঠি দিয়েছিলো, চিঠিটা আর কিছু নয়, তার ভাষায় এক 'অতীব আশ্চর্য ঘটনা'-র বর্ণনা। সম্বোধন কুশলাদি আর ইতি-টিতি বাদ দিলে চিঠিটা এরূপ—

'জানিয়া রাখিবে ইহা আমার বাষট্টি বছরের নাতিদীর্ঘ জীবনের সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ঘটনা। তোমার আগেকার পত্রগুলিতে এইসব ঘটনাবলীর ব্যাপারে বেশ একটা উপেক্ষা আর অবজ্ঞার ভাব অনুভবে টের পাইয়া মর্মাহত হইয়াছি। ভাই তুলু, সারা জীবন কুড়ি বর্গমাইলের সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের কী-ই আর জানিবো। তোমাকে দোষ দেই না। ইহা তোমার অদৃষ্ট। যাহা হউক, আজিকার ঘটনাটা আগে শুনিয়া লও, তাহার পর মন্তব্য করিও। বীরেন-খানসামার কথা তো তোমাকে আগের চিঠিগুলিতে লিখিয়াছি, উনি সেই বীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী যিনি পরবর্তীকালে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের খাস খানসামা পর্যন্ত হইয়াছিলেন। বীরেন বাবুর একটা পোষা মেনি-বিড়াল আছে, নাম ভিন্দি। অকর্মার ধাড়ী। বীরেনবাবুর বাড়িতে ইন্দুরে গিজ্‌গিজ্‌ করিতেছে অথচ ভিন্দি শুকাইয়া কাঠ। এমন কথা কদাপি শুনিয়াছো যে বিড়ালেতে ইন্দুরকে ভয় পায় ? ভিন্দি পায়। এহ্ বাহ্য। এমনও শোনা গিয়াছে যে, একদিন একটা হৃষ্টপুষ্ট তেজী ইন্দুর ভিন্দিকে বীরেনবাবুর রান্নাঘর হইতে বৈঠকখানা পর্যন্ত তাড়া করিয়া ফিরিয়াছিলো। ভাবিও না ধান ভানিতে বসিয়া শিবের গীত গাহিতেছি। এই পটভূমিকারও প্রয়োজন রহিয়াছে। ইন্দুরের জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া খানসামা-পত্নী একদা এক রাত্রিতে ভাতের

সহিত অতি উত্তম কালকূট মিশাইয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় রাখিয়া দিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য, ইন্দুর নিধন। ইন্দুর মরিলো না, সেই কালকূট মিশ্রিত অন্ন গ্রহণ করিয়া ভিন্দি মৃত্যুবরণ করিলো। বীরেনবাবুই পরেরদিন ভিন্দির ঠাণ্ডা মৃতদেহ কদলীবৃক্ষ বনের গোড়ায় নিথর হইয়া পড়িয়া আছে, দেখিতে পান। সবাই বিস্তর আহা-উহু করিলো। অতঃপর সকলে মিলিয়া ভিন্দিকে বাটির অদূরস্থ এক ধান্য খেতের ধারে মৃত্তিকা খুঁড়িয়া গাড়িয়া দিলো। আমিও অকুস্থলে উপস্থিত ছিলাম। বড়োই আশ্চর্যের ব্যাপার ইহা, যে, সেই মৃতা ভিন্দিই অদ্যকার প্রত্যুষে আমাদের সকলের চক্ষুর সম্মুখে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিলো। ইহা অতি সত্য ঘটনা। অপরের মুখে শুনিলে হয়তো অবিশ্বাস করিতাম, কিন্তু তাহা তো নহে। ইহা যে আমারই চক্ষের সম্মুখে ঘটিলো। ভাই তুলু, আমি বড়োই দুর্বল বোধ করিতেছি। ইহার সঠিক ব্যাখ্যা কী তোমার অভিধানে আছে? পৃথিবীর বড়ো বড়ো মনিষীগণই বা এই ঘটনাকে কী ভাবে গ্রহণ করিবেন?…'

সেই কুটি কবিরাজেরই এক বিচিত্র চিঠি দিন সাতেক আগে আমার হস্তগত হয়। অনন্তপুরে আস্তানা বদলের পর বছর দেড়েক আগে তার শেষ চিঠি পাই, এক অভিনব রাহাজানির সবিশেষ বর্ণনা দিয়ে প্রশ্ন করেছিলো, 'বলো, পৃথিবীতে টিকিয়া থাকা কী সম্ভবে কুলাইবে?' সেই শেষ। তারপর দেড় বছর পেরিয়ে গেছে। কুটি কি করছে, কেমন আছে, কোথায় আছে, কিছুই জানতে পারিনি। আমি উপর্যুপরি চারটে চিঠি লিখি তার কাছে, কোন উত্তর আসেনি। এই, হপ্তাখানেক আগের এক দুপুরবেলা আমার ধনফকীর লেনের বাসায় বসে বসে আবু মুনশীর (আমার প্রিয় লেখক) 'চণ্ডিগড়ের জামশেদ মুস্তফির হাড়

পিশাচ-রহস্য'টা পড়ছি, ঠিক এসময় কুটির সেই বিচিত্র চিঠিটা বয়ে নিয়ে এলো ডাক পিওন। ওর চিঠি পেয়েই অনন্তপুর রওনা হয়ে যাই। কিন্তু হতভাগা এই এক হপ্তার ভেতরই আবার ঠিকানা বদল করে ফেললো নাকি? ঠিকানা মতো অনন্তপুরের ফৈজি রোডের আঠারো নম্বর বাসায় গিয়ে বোকা বনে যেতে হলো। কুটি কবিরাজ-কে এরা চেনে না। তিনদিনে কারো সাথে পরিচয় নাকি খুব সহজে সম্ভব নয়। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই এই কথা শুনে, এ-যে কুটিরই পত্র-বচন। যাহোক, শেষমেষ ফৈজি রোড থেকে সোজা এসে উঠেছি এই চন্দ্রানী হোটেলে।

বলে নেয়া দরকার, হোটেলটা আমার মোটেই ভালো লাগেনি। এরকম নির্জন জায়গায় কী করে যে মানুষ থাকে! আবারো বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করে উঠছে।

উত্তরের জানালা দিয়ে অনেক দূরে আবছাভাবে দেখা যায় নীল-চে-সবুজ ধীলনের চূড়া, ডানে কুমুপাহাড়। কেমন রহস্যময় ঠেকে পাহাড়টাকে, অতিপ্রাকৃত বিশাল এক স্যালাম্যাণ্ডার যেন ওঁৎ পেতে বসে আছে। নাহ্, নাওয়া-খাওয়া সেরে কতোক্ষণ ঘুমিয়ে নেবো। মন-মেজাজ চাঙা হয়ে উঠতে পারে তাতে।

১ মার্চ। বেলা ২টা।

কিছুতেই ঘুম এলো না। মনে পড়লো কুটি কবিরাজের সর্বশেষ চিঠির কথাগুলো ডায়েরীতে লিখতে ভুলে গেছি। তাই আবার ডায়েরী নিয়ে বসতে হলো।

মেটে রঙের বিঘত খানেক লম্বা খামের ডান পার্শ্বে গোটা গোটা অক্ষরে 'কর্নেল (অবঃ) গোলাম আহমদ মুনতাসির হায়দার তুলু'—

নামটা দেখেই চিনে নিয়েছিলাম এ কুটি কবিরাজের চিঠি। এক কুটি ছাড়া আর কেউ আমার ডাক-নামটাকে ওইভাবে আসল নামের সাথে এক লাইনে জুড়ে দিতে সাহস পায় না। ধনফকীর লেনের বুড়ো মা'জন সোনামিয়ার কথা অবশ্যি আলাদা। মাঝে মাঝে ও 'তুলুমিয়া' বলে ডাকে আমাকে। সে ধর্তব্য নয়। বুড়ো আমাকে এই ফকীর লেনে উদোম নেংটো দৌড়োতে দেখেছে।

দেড়বছর পর কুটির চিঠিখানা পেয়ে বড়ো আনন্দ হয়েছিলো। কুটি তাহলে এখনো মরে-টরে যায়নি। আমার চেয়ে বছর দেড়-দুই-এর বড়ো হলেও কাঠি তার খুবই মজবুত। অনেকদিন বাঁচবে হতভাগা। ভাবলাম কুটির চেহারাটা এখন কেমন হয়েছে কে জানে।

কিন্তু খাম খুলে চিঠি পড়তে গিয়ে চমকে উঠি। কী এসব লিখেছে কুটি! জামশেদ মুস্তফি কে? পঁচিশ বছর ধরে তার পেছন পেছন ছায়ার মতোন ঘুরছে কুটি কবিরাজ। কেন?

কবিরাজের সেই বিচিত্র চিঠিটার আসল অংশ এই—'জামশেদ মুস্তফিকে তুমি চিনবে না। ইহার কথা পূর্বে তোমাকে বিশদ করি নাই। পঁচিশ বছর আগে ইনার সাথে আমার পরিচয় ঘটে। সেই যেবার করিমগঞ্জে চব্বিশ ঘণ্টায় বাইশ ইঞ্চি বারিপাত হইয়াছিলো, সেই বছরই মুস্তফি আমার দোকানে আসিয়াছিলেন তাঁহার ক্ষত আঙুলটা সারাইয়া লওয়ার জন্য। আমি দেখিলাম ইহা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় সম্ভব নয়। কী করিব ভাবিতেছি হঠাৎ বঙ্কু-নাপিতের কথা মনে পড়িয়া গেলো। আমাদের করিমগঞ্জের বঙ্কিমচন্দ্রের কথা তোমারও বোধহয় স্মরণে আছে। সার্জন হিসাবে তখনও তাহার খুব রোয়াব। ভালো কাটাকুটি করিতে পারে। আমি মুস্তফিকে বলিলাম, আঙুল কাটিয়া ফেলিতে হইবে। ইহা টাটাইয়া গিয়া

বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, কাটিয়া ফেলিলে দুই দিনেই আপনার আরোগ্য নিধান হইবে। আঙুল কাটাইতে মুস্তফি রাজি হইলে তাঁহাকে লইয়া বঙ্কুর কাছে গেলাম। ও ঘচ করিয়া ভদ্রলোকের কড়ে আঙুলটা কাটিয়া মলম লাগাইয়া দিলো। মুস্তফি বঙ্কুকে মজুরি বাবত একুশ টাকা দিলেন। বেদনা-নাশক ওষুধ বাবত আমা-কে দিলেন বারোআনা। ভদ্রলোক তাঁহার কর্তিত অঙ্গুলীটা এক টুকরো ন্যাকড়ায় জড়াইয়া লইয়া বঙ্কুর দোকান হইতে বাহির হইয়া গেলে ও আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া চক্ষুজোড়া বড়ো বড়ো করিয়া বলিয়া উঠিলো, "বাবুমশাই, দেখিলেন!" আমি বলিলাম, "কি রে ব্যাটা, কী আবার দেখিব?" ও বলিলো, "কেন, কাটা-পচা আঙুলটার যত্নের বহর! ভদ্রলোক অমন যত্ন করিয়া ওই পচা আঙুলটা না লইয়া গেলেও পারিতেন। আপনি খেয়াল করেন নাই, বাবু, আঙুলটা সীসার ডাগ্‌গার মতোন ভারি ছিলো, আর আমি যখন চাকু চালাইলাম কেমন অদ্ভুত আওয়াজ হইলো হাড্ডিতে। ওই হাড়ে একটা রহস্য আছে, বাবুমশাই!" ভাই তুলু, বঙ্কু-নাপি-তের এইসব বিচিত্র কথাবার্তা শুনিয়া বড়োই তাজ্জব হইয়া গেলাম। ও আবারো আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া এমন এক বিচিত্র সম্ভাবনার কথা শুনাইলো যে অনেকক্ষণ আমার বাক্‌শক্তি স্ফুরিত হইলো না। শেষে আমারো কেন জানি বিশ্বাস হইতে লাগিলো উহার কথাই ঠিক। তুমি ইহা শ্রবণ করিয়া বিশ্বাসই করিতে চাহিবে না যে বঙ্কু একটা পাকা চোর। ওইদিন রাত্রিতে তাহাকে দিয়া মেহেরজান হোটেলের রুম হইতে জামশেদ মুস্তফির কাটা আঙুল-টা চুরি করাইয়া আনাইলাম। বঙ্কুকে সোয়াশত টাকা দিতে হই-লো। ভাবিতে এখনো আমার গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে যে, বঙ্কু-

নাপিতের কথাই ঠিক ! জামশেদ মুস্তফি বয়েসে বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কেহই নাই। ভাবিয়া দেখিলাম, এইরূপ বয়োঃজীর্ণ বৃদ্ধ বড়জোর বছর পাঁচেক বাঁচিবেন। লাগিয়া থাকিতে পারিলে মৃত্যুর পর মুস্তফির সবগুলি হাড়ই আমার হস্তগত হইবে। সেইমতো চিন্তা করিয়া, ব্যবসায়পত্র সব বিক্রয় করিয়া দিয়া শিলং-এ চলিয়া আসি। মুস্তফি তখন শিলং-এ। আমার এখানে আগমনের উদ্দেশ্যই হইলো ইনাকে চোখে চোখে রাখা। বৃদ্ধ মুস্তফি কিন্তু পাঁচ বছর পরও দিব্যি বাঁচিয়া রহিলেন। দশ, বিশ, পঁচিশ বছর ভর জামশেদ মুস্তফির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছায়ার মতোন ঘুরিতেছি। কী জানি, কখন বুড়ার হাড়গুলি হাতছাড়া হইয়া যায় ! ভাই তুলু, আমি আর পারিতেছি না, বৃদ্ধ জামশেদের সঙ্গে সঙ্গে আমারও জীবনদীপ বোধহয় নির্বাপিত হইয়া আসিতেছে। কয়েক দিবস ধরিয়া দেখিতেছি মুস্তফি সাহেব অন্তিম শয়ানে শায়িত। যে কোন মুহূর্তে মৃত্যুর করুণ ঝাপ্টা ইনার বৃদ্ধ দেহে স্নেহের পরশ বুলাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমিও বোধহয় আর বেশিদিন বাঁচিবো না, শরীর বিশেষ ভালো যাইতেছে না। তুমি কী সময় করিয়া একবার অনন্তপুরে আসিয়া আমাকে দেখিয়া যাইতে পারো না ? তোমার কাছে একান্ত নিবেদন, খুব শীঘ্রই একদিন তুমি অনন্তপুরে আসো। এইক্ষণে তোমার সাহায্যের খুবই প্রয়োজন। জামশেদ মুস্তফির হাড়ের বিশদ আলোচনা এখানেই হইবে। যদি এমন হয়, যে, আমি আরো দশ-পনেরো বছর বাঁচিয়া থাকিবো, তবুও কথা দিতেছি—তোমাকে বঞ্চিত করিবো না। মুস্তফির মাথাটা তোমাকে দিয়া দিবো। বাজারে দাম ধরাইয়া দেখিয়াছি এইরূপ একটা মাথার দাম এই মফঃস্বলের বাজারেও সোয়ালাখ টাকার উপর দিয়া যায়। এইরূপ হইলে বাকি জীবনটা তুমি রাজার

হালে কাটাইয়া দিতে পারিবে।...'

ধেঁদড়া বুড়ো কাংনি। ২ মার্চ, রাত আটটা।

অপরিকল্পিত মোলাকাত ! প্রথমেই বলে নিই, কুটি কবিরাজের সাথে আজ এক পিকিউলিয়ার অবস্থায় দেখা হয়ে গেছে। এখন আমি কবিরাজের নূতন আস্তানায় বসে বসে ডায়েরী লিখছি। কুটি গেছে বাইরে। বললো, শাবল না কী যেন যোগাড় করতে যাচ্ছে। খুব রহস্যময় সব কাণ্ডকারখানা ঘটিয়ে চলেছে এই কুটি কবিরাজ। ওর কথাবার্তার ধরন দেখে মাঝে মাঝে আমার গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠছে।

কুটির সাথে কিভাবে মোলাকাত হলো বলছি। কিন্তু তার আগে আরো দুয়েকটি প্রাসঙ্গিক কথা বলে নেয়া দরকার।

রাতে ভালো ঘুম হওয়ায় ভোরে উঠে দেখলাম শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। তখন মনে হলো কুটিকে আজ যেমন করেই হোক খুঁজে বের করতে হবে। দেখলাম বুকের ভেতরের সেই খাঁ খাঁ ভাবটা আর নেই, তার জায়গায় একধরনের উত্তেজনা আর খুশির আমেজ। হোটেলের বয়কে ডেকে রুমেই খাবার দিতে বললাম। চারটা মুরগির ডিমের অমলেট, পরোটা, আলু আর শালগম ভাজি, সবশেষে দুই কাপ কড়া চা দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরেই কাপড়-চোপড় পরে তৈরি হয়ে নিলাম।

আমার মাথা ততোক্ষণে পুরোপুরি সাফ হয়ে এসেছে। এখানে কুটিকে কেউ চেনে না। কিন্তু মুস্তফিকে ? মৃত্যুশয্যাশায়ী জামশেদ মুস্তফিকে পাহারা দিচ্ছে কুটি কবিরাজ। তার মানে মুস্তফির আস্তানা খুঁজে বের করতে পারলেই কেল্লা ফতে। কুটিকে কোন না কোন

সময় ওখানে দেখা যাবেই। ভেরি গুড!

স্টেনলেস স্টীলের হালকা পাহাড়ে চড়ার ছড়িটা হাতে নিয়ে রূমে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কাউন্টারে হোটেলের ম্যানেজার বসে আছে। আমার দরকার জামশেদ মুস্তফির ঠিকানা যোগাড় করা। ম্যানেজারকে তাঁর কথা বলতেই চিনলো। কিন্তু দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়লো, সিলিং-এর দিকে আঙুল ইশারা করে বললো, 'মুস্তফি সাহেবের ঠিকানা তো এখন ওইখানে।'

সিলিং মানে আসমান, মানে, জামশেদ মুস্তফি আর নেই! মারা গেছেন ভদ্রলোক! কুটি কবিরাজের সব প্রতীক্ষার তাহলে অবসান হয়েছে! হঠাৎ মাথায় আরেকটা চিন্তা ঝিলিক দিয়ে গেলো। ভারাক্রান্ত ভাব নিয়ে ম্যানেজারকে বললাম, 'কিছু মনে করবেন না, আমার খুবই, মানে, ভীষণ দরকার,—জামশেদ মুস্তফিকে যে গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে তার ঠিকানাটা যদি দেন, তো বড়ো উপকার হয়।'

ম্যানেজারের চোখ সন্দেহে ঘোর হয়ে এলো। আমার আপাদমস্তক চোখ বুলোতে বুলোতে পেঁচার মতোন মুখ করে বললো, 'গোরস্থানের খবর কারা চায়, সায়েব?'

আমি চড়া গলায় বললাম, 'এই আমার মতো মানুষে, আর কী।'

লোকটা মিইয়ে গিয়ে বললো, 'জেয়ারত করবেন বুঝি? সোজা বড়ো কাংনির গোরস্থানে চলে যান, ধেঁদড়া বড়ো কাংনি। অনন্তপুরের উত্তরে, তিনমাইল। মুস্তফির ভাড়াটে আস্তানা এযাবত অই বড়ো কাংনিতেই ছিলো। ওখানেই ভদ্রলোকের ওফাত হয়।'

ছড়ি দুলিয়ে দুলিয়ে অনন্তপুরের সুমসাম সড়ক ধরে বড়ো কাংনির দিকে রওনা দিলাম।

এই অবস্থাতেই কুটি কবিরাজের সাথে মোলাকাত। আমি উঠছিলাম উপরের দিকে। দেখি উৎরাই বেয়ে বেয়ে একটা উস্কোখুস্কো চুলের জীর্ণশীর্ণ লোক নেমে আসছে। হাতে মস্ত একটা বাঁশ। চোরের মতোন আড়চোখে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চলেছে। তুরন্ত গতি। পাহাড়ের ওধার থেকে আনাজ-তরকারী বয়ে ক'জন লোক অনন্তপুরের দিকে নেমে যাচ্ছে। উপরের দিকে উঠছে আরো ক'জন।

লোকটা যখন আমার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে একটু মজা করার জন্যেই বলে উঠলাম, 'ধর্।' বলতেই দেখি লোকটা ঝেড়ে দৌড় লাগিয়েছে। দেখলাম আনাজ-তরকারীঅলারা একে চেনে। একজন বললো, 'কবর-পাগলাকে জব্বর ভয় পাইয়ে দিয়েছেন, সায়েব !'

আমার বুকটা ধক্ করে উঠলো। কবর-পাগলা! জিজ্ঞেস করলাম, 'লোকটাকে চেনো নাকি ?'

'ওকে কে না চেনে !' একজন খুব হেলাফেলায় বললো, 'ধেঁদড়া বড়ো কাংনির গোরস্থানের দারোয়ানের ফাঁকা ঘরটাইতো ও ব্যাটার আস্তানা। রাত-বিরেতে কবরে কবরে ঘুরে বেড়ায় হতভাগা।'

আরেকজন বললো, 'খুব অল্প সময়ের ভেতর এই এলাকায় একটা নাম করে ফেলেছে হারামজাদা !'

লোকটার কথা শেষ হতে না হতেই দেখি পাগলটা ফিরে আসছে। ধার ঘেঁষে যাওয়ার সময় ভয়ে ভয়ে তাকালো আমার দিকে। আমি আস্তে করে ডাকলাম, 'কুটি !'

কবর-পাগলা থমকে দাঁড়ালো। ভোম্বল ভোম্বল চোখে আমাকে দেখতে লাগলো। দু'চোখে অবিশ্বাস ! তরকারীঅলাগুলো ততোক্ষণে অনেক দূর চলে গেছে। আমি তার কাছে গিয়ে আবার ডাক-

লাম, 'কুটি।'

ও এবার ঘুমভাঙা স্বরে বলে উঠলো, 'কে? তুমি কে?'

'আমি তুলু।'

'তুলু! ত্-ত্-তুমিইই!' বলেই সেই নোংরা কাপড়েই কুটি আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

আমি বললাম, 'তোমার এ-কী অবস্থা!'

ও কাপড়-চোপড়ের দিকে একবার চোখ ফিরিয়ে বললো, 'কই, খুব বাজে নাকি?' হাতের আঙুল দিয়ে চকিতে চোখ দু'টি ঘষে নিলো, আনাড়িদের মতোন চুলগুলো পরিপাটি করার চেষ্টা করলো।

আমি বললাম, 'তোমাকে ফকীরদের মতোন দেখাচ্ছে, কুটি। খুবই বাজে!'

সেই জড়িয়ে-ধরা অবস্থাতেই বললো ও, 'সব ঠিক হয়ে যাবে ভাই, চিন্তা কোরো না। আমার চিঠি তাহলে পেয়েছিলে?'

পথের মাঝে দুই বুড়োর এরকম জড়াজড়ি কেমন বেখাপ্পা। তবু কুটি আমাকে ছাড়ছে না। আমি মাথা নাড়লাম। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছি, কথা বলার সময় কুটি সেই ভার-ভারিক্কি ভাষা ব্যবহার করছে না। বললাম, 'তুমি কী শুরু করেছো, বলো তো! তোমার কবিরাজী ব্যবসার কী হলো?'

'চুলোয় যাক কবিরাজী,' বেশ দাপটের সাথে বললো কুটি। তারপরই হঠাৎ কাশতে শুরু করে দিলো। কাশতে কাশতে প্রায় মাটিতে নেতিয়ে পড়ছিলো। আমি জড়িয়ে ধরে থাকলাম তাকে।

কুটি জানালো দু'মাস থেকে ও নাকি খুব অসুস্থ, বুকে পানি জমেছে, রাতে জ্বর বাড়ে, বুকে-পিঠেও ব্যথা।

আশ্চর্য থরথরে হয়ে উঠেছে কুটির চোখ দু'টি। কাশি থামলে

বললো, 'কবিরাজী দিয়ে কী করবো ভাই, যদি আরো ক'ঘণ্টা বেঁচে থাকি তো দেখতেই পাবে, আজ রাতেই তোমাদের কুটি কবিরাজ কোটিপতি বনে গেছে,' তারপর বেশ কতোক্ষণ আমার চোখে চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললো, 'ভালো করে আমাকে দেখো, তুলু। দেখে বলো, আমি কী আরো ক'টা দিন বেঁচে থাকতে পারবো না?' কী অদ্ভুত প্রশ্ন!

আমি তাকিয়ে দেখলাম সত্যিই কুটি বোধহয় আর বেশিদিন বাঁচবে না। বললাম, 'পাগল একটা! তোমার কী হয়েছে যে মৃত্যুচিন্তা করছো, যত্তোসব। নাও, চলো, আমি চন্দ্রানী হোটেলে উঠেছি, ওখানেই যাবো এখন।'

ও মাথা নাড়লো, 'উঁহু', এখন নয়, এখন বড়ো কাংনিতে ফিরে যেতে হবে। আজ শেষ রাতের দিকে এই অনন্তপুর, বড়ো কাংনি ছেড়ে চলে যেতে হবে। তোমাকেও আমার সাথে থাকতে হবে। ওজন তো আর কম হবে না। কমপক্ষে আধমণ।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'কিশের ওজন, কুটি!'

'হাড়ের। জামশেদ মুস্তফির হাড়ের।'

অই! তাহলে পাগলই হয়ে গেছে কুটি কবিরাজ। বললাম, 'কী যা-তা বকছো, চলো আমার সাথে করিমগঞ্জে, ওখানে নিয়ে গিয়ে তোমার চিকিৎসা করাবো। আমারো তো ত্রি-ভুবনে কেউ নেই, দু'বন্ধুতে মিলে মউজ্‌সে থাকা যাবে। চলো এখন হোটেলে ফিরে যাই।'

কুটি কবিরাজ হা হা করে হেসে উঠলো। তারপর কোমরে হাত দিয়ে সেই পাহাড়ী রাস্তায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে গমকে গমকে হাসতেই থাকলো। শেষে যখন তোড়ে কাশি এলো তখনই থামলো।

থেমে, কাশতে কাশতেই আমার ঘাড়ের কাছটা খিম্‌চে ধরে বললো, 'বড়ো খচ্চর হয়ে উঠেছো, না? সবার মতো, তুলু, তুমিও ভেবে বসলে আমি পাগল হয়ে গেছি। ওউফ!'

আমি বললাম, 'যেভাবে হাসতে শুরু করলে!'

কুটি আবার হা হা করে হেসে উঠলো। তারপর আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললো, 'শোনো তুলু, তোমাকে বলা হয়নি, সাতচল্লিশ দিন আগে মুস্তফি মারা গেছেন। এতোদিনে তাঁর মাংস-টাংসও হাড় থেকে ঝরে গেছে। এখন শুধু খট্‌খটে ঝক্‌-ঝকে হাড় ক'খানা কবর থেকে তুলে আনা। আজ পূর্ণিমা, আজকের রাতটার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছিলাম, রাতে ফিনিক্‌ ফোঁটা জ্যোৎস্না হবে।'

আমি মাথা নাড়লাম, 'উঁহু', তোমার কাজ-কারবার কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ও অসহিষ্ণু স্বরে বললো, ''কাজ-কারবারের আবার বুঝাবুঝি কী? এখন কোন প্রশ্ন করোনা ভাই, তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর আজই জামশেদ মুস্তফির কবরের পাশে দাঁড়িয়ে পেয়ে যাবে। তারপরই কী মনে পড়তে ক্ষুণ্ণ গলায় বললো, 'তোমাকে আমি চিঠি দিয়ে আনিয়েছি হোটেলে ওঠার জন্যেই কী? আমার আস্তানাটা একটু বিকট, তবু ওখানেই থাকবে তুমি। এসো আমার সাথে। দাঁড়াও—, আমি আগে আগে যাই, দূরের থেকে আমাকে অনুসরণ করে এসো তুমি। অনাবশ্যকে লোকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হবে, ভাববে কী ব্যাপার, পাগলের সাথে—'

এখন রাত দশটা। কোথা থেকে একটা কোদাল যোগাড় করে এই

মাত্র কুটি কবিরাজ ফিরে এসেছে। চারটা তন্দুর রুটি আর একটুখানি ভাজিও এনেছে সাথে করে। আমাদের রাতের খাবার। বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। রূপালী চাঁদটা স্নিগ্ধ আলো ছড়াতে ছড়াতে আকাশ গাঙে ভেসে ভেসে অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে।

রাত বারোটার দিকে মুস্তফির কবরে হানা দেবে কুটি। আমাকেও থাকতে হবে তার সাথে। কী যে ঘটতে চলেছে আল্লা জানেন। বেশ ভয় ভয় করছে। কুটি এখন পর্যন্ত হাড়ের রহস্য উন্মোচন করলো না। যতোবারই জিজ্ঞেস করেছি, বলেছে, অস্থির হচ্ছো কেন, রাত বারোটা বাজুক, তখন সবকিছুই দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ হয়ে যাবে।

কুটি ডাকছে খেয়ে নেয়ার জন্যে। খেয়ে উঠে এক ঘন্টার মতোন ঘুমিয়ে নিতে হবে দু'জনকে। তারপরই তো গোরস্থানে অভিযান! ও, হ্যাঁ, আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি,—আজ বিকেলবেলা একবার চন্দ্রানী হোটেলে গিয়ে ওখানকার ভাড়া-টাড়া মিটিয়ে দিয়ে আমার হালকা হাতব্যাগটা নিয়ে এসেছি। কুটি বলেছে, আজ রাতেই এখান থেকে ভাগতে হবে, ব্যাগটা হাতের কাছে রাখা ভালো। আড়াই টাকা দিয়ে একটা খালি আটার বস্তাও কিনে আনতে হয়েছে।

গোরস্থান। ৩ মার্চ, রাত দেড়টা।

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বাইরে এখন আমার মনমানসিকতা। যে বিস্ময়কর ঘটনা এই কিছুক্ষণ মাত্র আগে ঘটলো তা আমি লিখে কাউকে বিশ্বাস করাতে পারবো না। যুগপৎ আনন্দ এবং বিস্ময়ের এক প্রচণ্ড ধাক্কায় আম'র কথা বেরোচ্ছে না। অথচ কুটি কেমন নির্বিকার!

কবরের খোঁড়া মাটির পাশে চিৎ হয়ে শুয়ে উদাস দৃষ্টিতে চাঁদটার দিকে তাকিয়ে আছে ও। চাঁদের আলোয় আমি ডায়েরী খুলে বসেছি।

একথা এখন বলে নেয়া আবশ্যক মনে করি যে, এতোক্ষণে আমার সব প্রশ্নের সদুত্তর আমি পেয়ে গেছি। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য বিস্ময়,—অসম্ভব বিস্ময়কর ঘটনা,—দুর্ধর্ষ বিস্ময়কর অঘটন,—অবিশ্বাস্য ব্যাপার ইত্যাদি বিশেষণ যোগ করে বলতে গেলেও আজকের এই ঘটনাকে পুরোপুরি বিশেষণায়িত করা যাবে না। এবং সে ধৃষ্টতাও আমার নেই। ঘটনাটা সাদামাঠাভাবে এই—

ঠিক বারোটা পাঁচ-এ কুটি আমাকে ডেকে তুললো ঘুম থেকে। বাইরে তখন চাঁদের আলোয় উথালপাতাল। আটার বস্তাটা আমার হাতে তুলে দিয়ে কোদালটা কাঁধে তুলে নিলো ও। দু'জনে নিঃশব্দে গোরস্থানের নির্জন পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে জামশেদ মুস্তফির কবরের কাছে এসে দাঁড়ালাম। ভয়ে আমার শরীর কুঁকড়ে যাচ্ছিলো। একসময় ভেগে যাওয়ার চিন্তা করছিলাম, হতভাগা টের পেয়ে গিয়ে কসম খাইয়ে নিলো যাতে তাকে ফেলে রেখে না পালাই।

কবরখানার এখানে ওখানে উঁচু উঁচু ঢিবি চাঁদের আলোয় কচ্ছপের পিঠের মতোন জেগে আছে। সারা কবরখানা কেমন নিজ্‌ঝুম। মাঝে মাঝে সাঁই সাঁই বাতাস বইছে, তখন দূরে কোথা থেকে মেয়েছেলের করুণ কান্নার মতোন একটা শব্দ আমাদের কানে এসে আছড়ে পড়ছে। একটা কবরের ওপর বিরাট এক ছাতা মেলানো। অই দিকে তাকিয়ে আমার বুকটা ধক্‌ করে উঠলো। মনে হলো ওখানে একটা জোয়ান ব্যাটাছেলে ছাতার গায়ে হেলান দিয়ে বসে বসে একদৃষ্টে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে তাকিয়ে

দেখছে আমাদের কাণ্ডকারখানা। কুটি ততোক্ষণে মুস্তফির কবরে ধপাধপ কোদাল চালাতে শুরু করেছে।

আমি ফিসফিস করে বললাম, 'কুটি, দেখো তো, ওখানে যেন একটা লোক বসে আছে।'

ও চমকে উঠে কোদাল থামিয়ে ওদিকে তাকালো। তারপর ভীতু ভীতু হেসে বললো, 'গর্দভ, ওটা তো একটা ছাতা, লোক পেলে কোথায়!' বলেই কপালের ঘাম মুছে আবার কোদাল চালাতে লাগলো।

নিশুতি রাতের বিজন গোরস্থানে এই দুই বুড়োর কারবার দেখে হাজার সাহসী লোকও এখন ভিরমি খেয়ে ফিট হয়ে যাবে। কুটি কবিরাজকে দেখাচ্ছে এক খুদে প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতোন। ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলছে ও। ঘেমে নেয়ে উঠেছে। চাঁদের আলোয় দেখলাম ওর চোখ দু'টো চক্ষুকোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে, কপালের রগ ফুলে উঠেছে অস্বাভাবিকভাবে। পাগলের মতো কোদাল চালাচ্ছে কুটি।

আমি বললাম, 'কুটি, আমার কাছে দাও কোদাল, তুমি বসে একটু জিরিয়ে নাও, যা ঘামছো।'

ও ততোক্ষণে মড়্‌মড়্‌ শব্দে কবরের ছানি দেয়া চাটাইটা তুলে এনেছে। এই সামান্য শব্দেই সারা কবরখানা থরথর করে কাঁপতে লাগলো। আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেলো। বললাম, 'একটু আস্তে আস্তে কাজ করলে হয় না, কুটি। আল্লাহ্‌ জানেন, কী ভূতে তোমাকে পেয়েছে।'

ঠিক এ সময় ও কবরের উপরে বিছানো বাঁশগুলোতে হাত দিয়েছে। আস্তে আস্তে জামশেদ মুস্তফির কবরটা উন্মুক্ত হয়ে

পড়তে লাগলো। কেমন এক গরম বাতাস আমাদের ঘিরে বয়ে যাচ্ছে। মাথার উপর দিয়ে তিনটে বাদুড় উড়ে গেলো ডানা ঝটপট করতে করতে।

কুটি কবিরাজের থেকে তিন-চার হাত দূরে দাঁড়িয়ে চুপচাপ ঘামছি আমি। মনে হলো যুগ শতাব্দী হাজার বছর ধরে কুটি কবিরাজ জামশেদ মুস্তফির কবরের ওপরকার বাঁশগুলো সরিয়েই চলেছে।

হঠাৎ ধপাস করে একটা আওয়াজ হলো। চমকে তাকিয়ে দেখি কবরের শেষ বাঁশটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো কুটি। এবার ঝুঁকে পড়ে নিচের দিকে তাকিয়ে কী দেখছে! তারপরই গুরু গম্ভীর একটা স্বর আমার কানে এসে আছড়ে পড়লো, 'দেখো তুলু, এই সেই জামশেদ মুস্তফির হাড়!'

উথালপাতাল চাঁদের আলোয় সারা গোরস্থান ভেসে যাচ্ছে। মৃদু উষ্ণ এক রকমের বাতাস বইছে এখন, কেমন মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ সে বাতাসে। অমি উঁকি মারলাম জামশেদ মুস্তফির কবরে। সারা গা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। জ্যোৎস্নালোকিত কবরের ভেতর চুপচাপ শুয়ে আছে এক স্বর্ণ-কঙ্কাল!

এইচ বাই বারো গুলু খাঁ লেন

আমজাদের সেই গা-ছমছম-করা রোমাঞ্চকর গল্পটার নামকরণ আমিই করেছিলাম। লেন, বাই-লেন, তস্য লেন—এরকম একটা লেনের ভেতর ভয়ঙ্কর সব কাণ্ডকারখানার গা-শিউরানো এক নিঝুম বাড়ির গল্প। আমজাদ আমাকে বলেছিলো, রূপু, মুশকিলে পড়েছি গল্পটার নাম নিয়ে, মনঃপূত নাম খুঁজে পাচ্ছি না। আমি কিছুমাত্র চিন্তা না করেই বলেছিলাম, তাহলে এক কাজ কর্ না, এটার নাম দিয়ে দে 'এইচ বাই বারো গুলু খাঁ লেন'। আমজাদ আমার কথা রেখেছিলো। গল্পটা একটা দৈনিকে ছোটদের পাতায় ছাপাও হয়েছিলো।

তারপর অনেকদিন পার হয়ে গেছে। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর রাশিয়ায় একটা স্কলারশিপ পেয়েছে আমজাদ। দিন সাতেকের ভেতর ও চলে যাবে। কতোদিন পর দু'বন্ধুতে যে আবার দেখা হবে, তার ঠিক নেই। তাই একদিন, দু'জনে মিলে আমাদের চিরপরিচিত শহরটা ঘুরে বেড়াতে বেরোলাম।

শহরের অলি-গলি, বাজার-মার্কেট ঘুরতে ঘুরতে হয়রান হয়ে শেষে আমাদের এক পাঠশালার বন্ধু জহুরের ইটালি হোটেলে গিয়ে ঢুকলাম চা আর নানকাতাই খাওয়ার জন্যে। জহুরের দোকানের নানকাতাই আর ফিকে চায়ের একটা আলাদা সুনাম আছে। অনেকদিন পর আমাদের পেয়ে, জহুর কী যে খুশি হলো। খাবার পর চা আর বিস্কুটের পয়সা নিতে চায় না, শেষে জোর করে তার

ক্যাশ-বাক্সে পয়সাটা ঢুকিয়ে দিতে হলো। দোকান থেকে বেরোনোর সময় জহুর বললো, 'এতোদিন পর তোদের পেয়ে ভালো লাগলো, আবার আসিস, ভাই।'

জহুরের মুখে—'আবার আসিস, ভাই' কথাটা শুনে আমার বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠলো। এই কথাটা আমি যেন কোথায় পেয়েছি, কোন কাগজে বোধহয়। আমজাদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি ও একটু অন্যমনস্ক। আমি বললাম, 'এখন কোথায় যাওয়া যায় বলতো?'

ও বললো, 'চল্, এই গলি দিয়ে আরেকটু এগিয়ে যাই। কিছুদুর গেলেই দেখতে পাবি খুব সুন্দর একটা গির্জা আছে এখানে, সাইমন টেম্প্লারের বাংলোবাড়ির কাছেই।'

আমার মাথাটা হঠাৎ কেমন ঝিম্ঝিম্ করে উঠলো। সাইমন টেম্প্লারের বাংলোবাড়ি। একটা ক্যাসেটের রীল যেন খুব ধীরভাবে আমার মাথার ভেতর ঘুরতে থাকে। শুনি কে যেন বলছে—সাইমন টেম্প্লারের নিঃসঙ্গ বাংলোটাকে বাঁয়ে রেখে গির্জার বাউণ্ডারী ওয়ালের দক্ষিণ-পুব ঘেঁষে চলে যাওয়া ছোট্ট লেনের দিকে হেঁটে যায় ওরা,…কারা? কারা হেঁটে গেছিলো ওই লেন দিয়ে? কিছুতেই মনে করতে পারি না। মাথার ভেতরে ক্যাসেটের রীল কখন আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেছে।

আমজাদ বললো, 'দেখ, রূপু, কি সুন্দর গির্জা! এতো হৈ-চৈ আর লোকজন বসত-বস্তির ভেতরেও গির্জাটা কেমন চুপচাপ। ফ্যানটাস্টিক।' দেখলাম এই নিঃসঙ্গতার ভেতর সুন্দর একটা পুরনো কাঠের বাংলোও চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আমজাদ হাত ইশারায় সেটা দেখিয়ে বললো, 'সাইমন টেম্প্লারের বাংলো।'

আমার বুকের ভেতরটায় কেন জানি ড্রাম বাজতে লাগলো। ঘামে হাতের তালু ভিজে উঠেছে। আমজাদকে বললাম, 'চল্, ফিরে যাই।'

ও অন্যমনস্কভাবে আমার হাত চেপে ধরে একটা ছোট্ট অচেনা গলির ভেতর ঢুকতে ঢুকতে বললো, 'বোকা, এখনি যাবো কি রে, মোটে এখন সোয়া বারোটা বাজছে !'

ঘিঞ্জি গলির ভেতর দিয়ে, আমরা যেন যুগ শতাব্দী হাজার বছর ধরে হাঁটতে থাকি। আমাদের ডানে-বাঁয়ে নোংরা স্যাঁতা-পড়া ঘরবাড়ি, দর-দালান। দালানগুলোর ইট-মাটি-সিমেণ্ট ক্ষয়ে গিয়ে দরজা-জানালার কাঠ-টাঠ পোকায় খেয়ে ফেলেছে। ফাটা দেয়ালের ভেতর থেকে বটগাছ আর আমঘুরুজের লতা জড়াজড়ি করে আসমানে ডালপালা মেলে দিয়েছে। দোকান কোঠা, প্রেস, বুক-বাইণ্ডিং, জিঞ্জিরশাহ্র মাজার আর তার লাগোয়া দফতর; চামড়ার ট্যানারি আর জুতোর গুদাম, মিয়াচান ব্যাপারীর চালের আড়ত, চিত্রকর-এর 'চিত্রলেখা' চিত্রহাউস, চায়ের স্টল ; ধুন্ধুমার রেস্তোরাঁ আর 'খাসির মাংস চাটনি কাবাব হোটেল', মাসিক উত্তরায়ন অফিস, কপিধ্বজ ব্রাঞ্চ সংঘ ইঃ লিঃ; ফুলুরি-পেঁয়াজু হাউস—হেনো তেনো হাজার কোঠার গতির ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ আমার ভীষণ পিপাসা পেয়ে যায়। আমজাদকে বলি, 'আমজাদ, আমি পানি খাবো।' দুজনেই এবার এদিক ওদিক তাকিয়ে কোন টিউবওয়েল বা হাইড্রেন্ট বা রেস্টুরেন্ট-টেস্টুরেন্ট খুঁজতে থাকি। পানি পাওয়ার মতোন অনেক রেস্টুরেন্ট আর হোটেল আমরা পেছনে ফেলে এসেছি। এদিকে, পিপাসায় আমার জিভ শুকিয়ে আসছে।

আমজাদ বললো, 'চল, ওই পাঁচিল-ঘেরা বাড়ির ভেতর ঢুকে

এইচ বাই বারো গুলু খাঁ লেন

পড়ি, ওখানে নিশ্চয় পানি পাওয়া যাবে।' এতো ব্যস্ত গলির ভেতরেও বাড়িটা আশ্চর্য এক নির্জনতায় আচ্ছন্ন।

আমরা গেট খুলে বাড়িটার উঁচু বারান্দায় উঠে কলিংবেলের লাল বোতাম টিপে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমজাদ ফিস-ফিস করে বললো, 'বাড়িতে কেউ নেই বোধহয়, দেখেছিস, কেমন নিজ্‌ঝুম এখানটা!'

হঠাৎ আমার চোখে পড়ে বারান্দার ডানদিকের বিশাল কাঠের দরজার মাথার ওপর পোকাধরা একটা কাঠের বোর্ড। তাতে স্পষ্টভাবে গোটা গোটা হরফে লেখা, 'ড্রিম-কটেজ'। নিচে ছোট ছোট অক্ষরে: এইচ/১২, হাজি মুহম্মদ গুলু খাঁ লেন।

এই লেনের নাম তাহলে গুলু খাঁ লেন। আমার কেমন শীত শীত করতে থাকে। কপালে চিন্‌চিনে ঘাম দেয়া দেয়। বিদ্যুৎচমকের মতোন মনে পড়ে যায় আমজাদের সেই গল্পের কথা। গল্পটায় এই লেনেরই উল্লেখ আছে। আর—আর 'স্বপ্ন-কুটির' বলে একটা বাড়ির কথাও।

এতোক্ষণে আমজাদও দেখতে পেয়েছে বোর্ডটাকে। ও বিস্ফারিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার কাঁধের কাছটা খামচে ধরে ফিসফিসিয়ে ওঠে, 'রূপু, বিশ্বাস কর—বিশ্বাস কর, জীবনে আমি এ গলি দিয়ে আসিনি, এখানকার কিছু আমি চিনি না, অথচ হুবহু—'

কলিংবেলের আওয়াজ কাউকে বাড়ির ভেতর থেকে এদিকে টেনে আনছে বুঝতে পারি। স্যাণ্ডেলের চটাশ্‌ চটাশ্‌ শব্দ কাছে এগিয়ে আসছে—

আমজাদের গল্পের শেষ দিকটা মনে পড়ে যেতেই একটা হিম-

স্রোত বয়ে যায় আমার সারা শরীরে।

গল্পের ছেলেদু'টো কোনদিনই আর এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে না।

এইচ বাই বারো গুলু খাঁ লেন

ফতেহ্‌গড়ের তান্ত্রিক

['ত্রিলোচন হোড় কী কোন প্রেতসিদ্ধ পুরুষ? তান্ত্রিক? কাপালিক? ইহাকে দেখিলে যেমন তেমন একটা মামুলী মানুষই মনে হইবে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কী এক দুজ্ঞেয় শক্তি যে ইহাকে চালনা করিতেছে তাহা শুধু অনুভবের ব্যাপার।'
কী অনুভব করলো কুটি কবিরাজ?]

•

অনন্তপুরের সেই বিচিত্র ঘটনারপর কুটি কবিরাজকে একটা স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি করে দিয়েছি। জামশেদ মুস্তফির হাড়গুলো আছে আমার জিম্মাতেই। কুটি তার কথা রেখেছে। মুস্তফির করোটিটা তৎক্ষণাৎ আমাকে প্রেজেন্ট করে দিয়েছে। আমি অবশ্যি ওটা পেয়ে মনে মনে হেসেছি, কুটি কি আমাকে বাচ্চা ছেলে ভেবে বসলো? সেই গোরস্থানে দাঁড়িয়েই আমি কুটিকে বলেছিলাম, ভাই কুটি কবিরাজ, স্বর্ণ-করোটি দিয়ে কি তুমি ঋণ শোধ করতে চাইছো! আজ রাতে এখানে দাঁড়িয়ে যে রোমহর্ষক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করলাম এর দামই তো তোমার এই স্বর্ণ-করোটির দেড়া। আমাকে লজ্জা দিও না। যদি চাও যে এগুলো আমার হেফাজতে থাকবে, তো সে আলাদা কথা।

কুটির চিকিৎসাপত্র আর স্যানাটোরিয়ামের খরচাপাতি কুলোনোর জন্যে মুস্তফির পায়ের বুড়া আঙুলের ছোট্ট দু'টো হাড়

চৌত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে বিক্রি করেছিলাম। হাড় বিক্রয়ের পুরো ব্যাপারটা কুটিকে লিখে জানাই। সব শুনে-টুনে কিছুদিন আগে স্যানাটোরিয়াম থেকে আমার ধনফকীর লেনের ঠিকানায় একটা চিঠি লিখেছে ও। লিখেছে, আমি যেন অতি অবশ্যই জামশেদের উরুর একটা হাড় বিক্রি করে ওই টাকা দিয়ে সিলেটের উত্তরাঞ্চলে একটা নিরিবিলি জায়গায় প্লট কিনে, সুন্দর একটা বাংলোবাড়ি তোলার কাজ শুরু করে দিই।

হতভাগা আমাকে ডোবানোর তালে আছে। এমনিতেই সেদিন সোনার দোকানের লোকটা কেমন চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিলো আমাকে। চৌত্রিশ হাজার টাকা হাতে তুলে দেয়ার সময় বলেছিলো, 'গরম জায়গায় হাত দিয়েছেন সাহেব, হাত পুড়ে যাবে, ও ব্যবসা ছাড়ুন।'

আজ ক'দিন থেকে প্রচণ্ড গরম পড়েছে। তার ওপর আমার ধনফকীর লেনের এই একতলা ফ্লাটের ইলেকট্রিক লাইনও গেছে কেটে। পাখা বন্ধ। গরমে হাঁসফাঁস করছি। একবার ভেবেছিলাম আবু মুনশীর 'অলৌকিক আলোর রহস্য'-টা নিয়ে বসবো। বইটার সাতচল্লিশ পৃষ্ঠা আগেই শেষ করে রেখেছি। কিন্তু এখন আর ইচ্ছে হচ্ছে না। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে কিছুক্ষণ আগে শিশুকে বলেছিলাম এক গ্লাস লেবুর শরবত করে দিতে। সে ব্যাটাও দেখছি এতোক্ষণ ধরে লাপাত্তা। শিশুর কথা আগে বলিনি, এ হচ্ছে আমার কম্বাইণ্ড-হ্যাণ্ড। শিশু-মিয়া আসলে শিশু নয়, রীতিমতো জোয়ান ব্যাটাছেলে। রাঁধে ভালো, বাজার-টাজারেও ওস্তাদ। প্রচুর গল্পের বই পড়ে। বাহরাম-সিরিজ প্রিয়। 'বাহরামের অট্টহাসি' বইটা পড়ে একদিন সারা

দুপুর আহা, অহো…চ্চ্ঃ চ্চ্ঃ চুঃ করে কাটিয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কি ব্যাপার শিশু মিয়া, কোন অ্যাক্সিডেন্ট-ফ্যাক্সিডেন্ট…'

শিশু তখন পাঁচমুখ হয়ে বাহরামের বাখান শুরু করে দিয়েছিলো, 'হতভাগা লাল সাহেব, বুঝলেন-চাচাজী, বাহরাম ভাই হতভাগা লাল সাহেবকে গরু বানিয়ে…' বলেই জিভে কামড় বসিয়ে দিয়েছে। আর যাই হোক, গল্পের নায়ককে জলজ্যান্ত ভাই বানিয়ে নেয়ার মতো নাদান সে তো নয়!

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তালপাখার বাতাস খাচ্ছি এমন সময় 'চাচাজী, আপনের চিঠি' বলে শিশু মিয়া রূমে ঢুকলো। এক-হাতে মেটে রঙের একটা খাম আরেক হাতে বড়োসড়ো ধব্‌ধবে সাদা এক চাঙড় বরফ। হাত বাড়িয়ে খামটা নিলাম। ঠিকানার জায়গায় —'কর্নেল (অবঃ) গোলাম আহমদ মুনতাসির হায়দার তুলু' নামটা দেখেই বুঝলাম এ কুটি কবিরাজের চিঠি। কুটি পুরো লাইনে নামটা লিখে শেষে ডাক নাম 'তুলু'-টাও জুড়ে দেয়। হতভাগা ডোবালো আমাকে। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, আমার এই বাষট্টি বছরের ভার-ভারিক্কি চেহারার সাথে অই 'তুলু' নাম যে-ই শুনবে, হেসে অস্থির হবে।

কুটি কবিরাজের চিঠি পড়তে গিয়ে চমকে উঠি। সুস্থ হয়ে উঠেছে ও। সে তো উঠবেই। কিন্তু আবার এ কোন্ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চলেছে কুটি কবিরাজ? চিঠির মূল অংশ এরূপ—

'সম্প্রতি আর এক অতীব বিচিত্র রহস্যের সম্মুখীন হইতে চলিয়াছি। ত্রিলোচন হোড় কী কোন প্রেতসিদ্ধ পুরুষ? তান্ত্রিক?

কাপালিক? ইনাকে দেখিলে যেমন তেমন একটা মামুলী মানুষই মনে হইবে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কী এক দুর্জ্ঞেয় শক্তি যে ইনাকে চালনা করিতেছে তাহা শুধু অনুভবের ব্যাপার। পত্রে বিস্তারিত বিশদ করা আদৌ সম্ভবে না। পত্রপাঠ ফতেহ্‌গড়ের অদিতি হোটেলে চলিয়া আসিবে। এক্ষণে আমি অদিতি হোটেলের ১৮ নং কক্ষে অবস্থান করিতেছি। দিন সাতেক আগে স্যানাটোরিয়াম ত্যাগ করিয়া…'

কুটি কবিরাজের এসব 'অতীব বিচিত্র ঘটনা'গুলোকে এখন আর আমি অবজ্ঞা করে উড়িয়ে দিই না। এতোদিনে টের পেয়েছি কুটি কবিরাজের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের পরেও আরেকটা ইন্দ্রিয় আছে, যেটা তাকে বিচিত্র সব কাণ্ড-কারখানার সন্ধান দিয়ে বেড়ায়। কুটিকে আমি শ্রদ্ধা করি।

যাইহোক, ঐদিন রাতেই ফতেহ্‌গড়ের উদ্দেশে মেল-ট্রেনে চড়ে বসি। সারারাত এবং পরের সারাটা দিন ট্রেনে কাটিয়ে, ফতেহ্-গড়ের ইস্টিশনে নামলাম রাতের পয়লা প্রহরে। ইস্টিশনে নেমেই শুনলাম এদিকটায় এখন বাঘের উৎপাত চলছে। সারা শহরই এক বুকচাপা আতংকে মরে আছে যেন। আমার গা শির্‌শির্ করতে লাগলো। কোন রকমে অদিতি হোটেলে পৌঁছতে পারলেই বাঁচি। একটা অটোরিক্সা ভাড়া করে হোটেলের দিকে রওনা দিলাম।

কুটি কবিরাজ হোটেলেই ছিলো। আমাকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলো। হতভাগাকে এখন আর চেনাই যায় না, স্বাস্থ্য-টাস্থ্য আগের কুটির তিনগুণ হয়ে গেছে। টুকটুকে ঠোঁট, আর গায়ের রঙে কেমন গোলাপী আভা। অসুখের পর স্যানা-টোরিয়ামে ভালো ভালো খাবার আর ওষুধ খেয়ে চোষট্টি বছরের

কবিরাজের বয়েস যেন পঞ্চাশ-পঞ্চান্নয় নেমে এসেছে।

আমি বললাম, 'তোমাকে দেখে খুব খুশি লাগছে কুটি, স্বাস্থ্য ফিরিয়ে নিয়েছো!'

কুটি হা হা করে হেসে উঠলো। বললো, 'ভালো দেখাচ্ছে, না? সে তোমারই দান, তুলু। তুমি যদি স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি-না করতে এতোদিনে বড়ো কাংনির গোরে কচি কচি সবুজ ঘাস গজাতো। যাক, চলো, আগে খাওয়া দাওয়া সেরে নাও।'

আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিসফিসিয়ে বললাম, 'তোমার প্রেতসিদ্ধ পুরুষটি কোথায়?'

'হবে, সব হবে। আগে খাওয়া সেরে নাও তো। হাত-মুখ ধোবে, নাকি প্রথমেই ডাইনিং-হল?' কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে থামলো ও।

কুটি হোটেলঅলাদের বলে আয়োজন করেছিলো ভালো। ধব্‌ধবে সাদা টেবিলের ওপর রাখা ভাপ-ওঠা পোলাও-কোরমার ডিশ আর বাটিগুলোই পেটে আগুন ধরিয়ে দিলো। চিকেন-ফ্রাই, ভেজিটেব্‌ল্‌স্‌ চপ, মাটন-চপ, স্যালাড, পুরু করে মাখন আর দুধের ক্ষীর লাগানো স্লাইস্‌ড পাউরুটি, মটরশুঁটি সেদ্ধ,—সেও আবার মাখনে চোবানো হয়েছে। দুধমালাই আর দু'রকমের ছানার মিষ্টি। উঁহুঁ! আমি এগুলো খাবো না দেখবো ভেবে দিশে পাচ্ছি না। কুটি পিঠে চাপড় লাগিয়ে বললো, 'নাও, তুলু, শুরু করা যাক, বড়ো ভুখ লেগেছে।'

দু'বুড়োতে আর কতো খাওয়া যায়। এক সময় ক্ষান্ত দিয়ে উঠে পড়ি। কুটির কাঁধের কাছটায় আস্তে করে একটা চাপড় কষিয়ে শুধু বললাম, 'চিয়ারস্‌, কুটি!' হতভাগা এরকম খাওয়া খেয়েই

অমন শুয়োরের মতোন মোটা হয়ে উঠেছে।

রাত দশটার দিকে ত্রিলোচন হোড়কে দেখতে অদিতির বত্রিশ নম্বরে গিয়ে হাজির হলাম। যোগাসনে বসেছিলেন ত্রিলোচন হোড়। বয়স্ক নমস্য ব্যক্তি। নিমীলিত চোখ। সাদা চুল, সাদা ভুরু। দেখলেই বোঝা যায় শ'য়ের ওপর বয়েস। কিন্তু আশ্চর্য এই, ভদ্রলোকের হাত-পা গাল-কপাল গলার চামড়া কেমন টান্ টান্।

আমি কুটিকে বললাম,'যোগাসনের এই এক আশ্চর্য উপকারিতা, দেখো কবিরাজ, এনার শরীর এখনো কেমন অটুট।'

কুটি কবিরাজ রহস্যময় হাসি হেসে ফিসফিসিয়ে বললো, 'তুলু, তোমাকে আরেকটা বিচিত্র খবর দিই, এই হোড় মশাই একজন পাকা ঘোড়সওয়ারও।'

কুটির কথা শুনে চমকে উঠলাম। কুটি কি পাগল ? বললাম, 'তুমি কি আমাকে পাগল-বুঝ দিচ্ছো কবিরাজ ? এবয়েসে ঘোড়ায় চড়া…'

কুটি আবারো সেই রহস্যময় হাসি হাসলো। বললো, 'আমি নিশ্চয় করে বলছি, তুলু, ইনি শুধু পাকা ঘোড়সওয়ারই নন, একজন ভালো পোলো খেলোয়াড়ও। গত এক হপ্তা যাবত অনেক কষ্ট করে আমি এই তথ্য অবগত হয়েছি। আরো অনেক তথ্য হাতে আসার পথে, ধীরে ধীরে সব বলবো তোমাকে।'

প্রায় কুড়ি মিনিট বসে থাকার পর ত্রিলোচন হোড় চোখ মেললেন। কুটিকে দেখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো তাঁর ঠোঁটে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে তাকালেন। কুটি আমার পরিচয় দিলো। বৃদ্ধ খুশিমনে মাথা হেলালেন।

ত্রিলোচন বাবুর চোখের দিকে তাকাতেই আমার গা শিউরে উঠলো। বুড়ো মানুষের অমন জ্বলজ্বলে চোখ আর কখনো দেখিনি।

মাঝে মাঝে সেই চোখে সবজেটে আভা ঝিলিক্ মারছে। গলার শিরাগুলো প্রচণ্ডভাবে ফুলোনো, আর কণ্ঠার তুই হাড়ের মাঝখানে কালো সুতো দিয়ে বাঁধা ছোট্ট বাদামী রঙের একটা কবচ। হোড় মশাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনাদের আপ্যায়ন করার মতো কিছু নেই। তাছাড়া আমি যা খাই তা আপনারা খাবেনও না। তবু খুশি হবো যদি একটু দুধ পান করেন।'

তিনি একটা লোটা থেকে দু'গ্লাস দুধ এনে আমাদের খেতে দিলেন। আমি বললাম, 'আপনি এতো ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমরা শুধু আপনাকে দেখতে এসেছি। আমার এই বন্ধুর মুখে আপনার এতো নাম শুনলাম যে দেখতে না এসে থাকতে পারলাম অক্...।' কুটি আমার পেটে তার কনুই দিয়ে গুঁতো মেরেছে।

ত্রিলোচন হোড়ের সাথে গল্প হলো অনেকক্ষণ। রূমে যখন ফিরে এলাম রাত বারোটা বাজছে তখন। ঘুমোতে যাওয়ার আগে কুটি কবিরাজ বললো, 'ত্রিলোচন হোড়কে কেমন দেখলে, তুলু?'

আমি বললাম, 'তোমার তুর্জ্ঞেয় রহস্য মণ্ডিত শুদ্ধ তান্ত্রিক ত্রিলোচন হোড় তো নেহায়েত সাদামাঠা এক বুড়ো, বয়েস আমাদের চাইতে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর বেশি হবে; এই তো! তবে এ-কথা ঠিক, ওনার চোখ তুটো মারাত্মক, কেমন ভয় ধরিয়ে দেয়।'

কুটি হেসে বললো, 'দাঁড়াও, দেখাচ্ছি তোমাকে হোড় মশাই কী পদার্থ!'

ফতেহ্‌গড়ের এই অদিতি হোটেলে আজ আমার শেষ দিন। আমি আর কুটি কবিরাজ আজ রাতেই সিলেট ফিরে যাচ্ছি। এক রোমহর্ষক বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে আমার ফতেহ্‌গড়ের ভ্রমণ শেষ হয়ে-

ছে। এই অতি আশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করানোর জন্যে কুটি কবিরাজ-কে ধন্যবাদ। ব্যাপারটা চুকে-বুকে যাওয়ার পর কুটি অবশ্যি স্বীকার করেছিলো এরকমটি যে ঘটবে সে জানতো না। সে শুধু আমাকে হোড় মশাই-এর রূমে নিয়ে গেছিলো, এতোক্ষণে রূম খালি হয়ে গেছে মনে করে। কে জানতো ত্রিলোচন বাবু তখনো ঘরে বসে আছেন। ব্যাপারটা খুলে বলি।

একদিন রাত দু'টোর দিকে কুটি কবিরাজ আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বললো, 'চলো, তুলু, দেখে আসি ত্রিলোচন হোড় এখন কী করছেন।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'এখন রাত ক'টা বাজে? এখন সেখানে গিয়ে কী হবে?'

ও ফিসফিস করে বললো, 'দেখবে, চলো, তোমাকে এক তেলেস্-মাত কাণ্ড দেখাবো।'

পা টিপে টিপে আমরা একটা ছোট্ট ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ি। ত্রিলোচন হোড়ের ৩২ নং। আমার গা শিরশির করে ওঠে। দরজা ভেজানো। ভেতরে নিবু নিবু বাতি জ্বলছে। আস্তে আস্তে দরজাটা খোলে কুটি। ভেতরে পা দেয়ার সাথে সাথে জমে পাথর হয়ে যাই দু'জন। স্থির সবুজ একজোড়া চোখ ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। ছায়া ছায়া আলো-আঁধারির মাঝে ভয়াল এক আদি হিংস্র ডোরা-কাটা বিশাল বাঘ। তার সবুজ জ্বলজ্বলে দু'টি চোখ। আমাদের পা যেন খিল মেরে মাটির সাথে গেঁথে দিয়েছে কেউ।

এই বিকট অবস্থার ভেতরও এক আজব কাণ্ড করে বসলো কুটি কবিরাজ। হাতজোড় করে সেই বাঘের দিকে তাকিয়ে, ঠাণ্ডা রাগী রাগী গলায় বললো, 'মাফ করবেন, ত্রিলোচন বাবু, আমি ভাবি

নাই এখনো আপনি ঘরে বসে আছেন, নইলে আরেকটু দেরি করে আসতাম।'

ত্রিলোচন বাবু কুটি কবিরাজকে লেজ দিয়ে চড়াৎ করে একটা বাড়ি মেরে, লাফ দিয়ে দরজা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আমি তখনো ঘামছি।

বাদুড়

[কাকে যেন নিজ আস্তানায় ধরে এনেছে কুটি কবিরাজ। ক'দিন পরই কর্নেলের কাছে বেনামী চিঠি এলো, আর মাত্র বারো ঘণ্টা পরই খুন করা হবে কবিরাজকে। কিন্তু বারো ঘণ্টা পেরোতে না পেরোতেই…]

কুটি কবিরাজকে ঘিরেই যতো অঘটন। মাস দুয়েক আগে, সুলতান হোটেলে রাতের ভাত খেয়েই তাড়াহুড়ো করে উঠে গিয়েছিলো কুটি জাফলং-এর বাস ধরার জন্যে। রাতে তামাবিল লাইনের অই একটাই বাস, এটা মিস্ করলে তার নাকি মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে জাফলং-এ এক ভয়ঙ্কর প্র্যাকটিস জমিয়ে ফেলেছে ও। পাহাড়ী রাজ্যের সেই নিরিবিলি টিলার ওপরে নতুন বাংলোতে বসবাসের পরও, হপ্তায় একদিন করে কুটি কবিরাজ আমার ধনফকীর লেনের বাসায় বেড়িয়ে যায়।

তো, ওই সুলতান হোটেলে ভাত খেয়ে চলে যাওয়ার পর দু'-মাস—কুটি লাপাত্তা। আজ দুপুরে, কুটি-সম্পর্কিত এক বেনামী চিঠি এসে হাজির। হলুদ খামে স্থানীয় পোস্ট আপিসের ছাপ-টাপ মারা। চিঠিতে কে বা কারা ভয় দেখাচ্ছে এই বলে যে, আর মাত্র বারো ঘণ্টা পরই কুটি কবিরাজকে খুন করা হবে। ও নাকি তাদের একজন সঙ্গীকে বেশ কতকদিন ধরে আটক করে রেখেছে। তারা এর চরম প্রতিশোধ নেবে। চিঠিতে বলা হয়েছে এখনো সময়

আছে, আমি যেন কুটিকে গিয়ে সামলাই।

আশ্চর্য রহস্য তো! কুটি এ কোন্ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে? কেমন এক অস্বস্তি চেপে বসে বুকের ভেতর। ব্যাপার ততো সুবিধের না বোধহয়। কাল রাতে কুটিকে স্বপ্নে দেখেছি। দেখেছি, সাদা কাফন পরে কুটি কবিরাজ একটা উঁচু সড়ক দিয়ে হেঁটে চলেছে। এ অবস্থায় তাকে দেখতে পেয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কুটি, তুমি কবে মারা গেলে? ও কোন কথা না বলে হেঁটে চলে গেলো।

এক বিচিত্র আশংকা নিয়ে এগারোটার বাসে চেপে জাফলং পৌছোই। যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, কুটিকে হুঁশিয়ার করে দেয়া দরকার।

একথা বলে নেয়া এখন উচিত মনে করি, যে, কিছুদিন আগে এক জ্যোতিষীর গণনায় ধরা পড়েছে কুটি কবিরাজের আয়ু আর বেশিদিন নয়। কিভাবে মারা যাবে জিজ্ঞেস করায় জ্যোতিষী বলেছিলেন, রোগ-ব্যাধি, বার্ধক্য-পীড়া—এসব কিছু নয়, অপঘাত মৃত্যু যোগ। সেই থেকে ও একটু সাবধানে থাকে। মোটরগাড়ি, ট্রেন-ফ্রেন, কাঁটাঅলা মাছ, পুকুরে ডুব দিয়ে গোসল, মারামারি-হাঙ্গামা—এসব থেকে যদ্দুর সম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করছে। সন্দেহ হয় সত্যিই কি কুটি এসব হাঙ্গামা-হুজ্জত থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করছে? যদি করতো, তো এই বেনামী চিঠি আর খুন করবার হুমকি কেন?

নিরিবিলি টিলার ওপর সুন্দর বাংলোবাড়ি বানিয়েছে কুটি কবিরাজ। ঠিক যেন ছবি, দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। বাড়িটার নাম

'নির্জন'। আমি যখন ওখানে পৌঁছোই ; দেখি, কুটির চাকর আর-মান আলী বাংলোর লনে দাঁড়িয়ে গোলগাল। একটা দশ কেজি ওজনের পাথর নিয়ে যাচ্ছেতাই ধরনের অবহেলায় ওটাকে লোফা-লুফি করছে। এই আরমান আলীকে তিনমাস আগেও যখন দেখি, দেখেছিলাম, আশ্চর্য হ্যাংলা হাড়-জিরজিরে প্যাকাটির মতোন এক ছোকরা। আর এখন এ কী দেখছি ! এতো তাড়াতাড়ি অমন শুয়োরের মতো তেল চুকচুকে তাজা হয়ে উঠলো কী করে ? আমাকে দেখেই 'স্লামালেকুম, চাচা' বলে হাসলো ও। পাথরের লোফালুফি তখন থামিয়েছে।

আমি তাজ্জব হয়ে বললাম, 'তোমার স্বাস্থ্যের এমন বীভৎস উন্নতি হলো কেমন করে হে !'

'জি, সবই খুদার মর্জি,' আরমান মুচকি হেসে বললো, 'এ আমার কবিরাজ চাচার হেকমতি !'

হেকমতি ! কুটি কবিরাজের হেকমতি ! আমি আরো তাজ্জব বনে যাই, কুটি তাহলে এমন এক আয়ুর্বেদী দাওয়াই আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। আরমানের হাসি ততোক্ষণে দুই কান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছি আর হতভাগা কুটি কবিরাজের কাণ্ড দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। শেষে বললাম, 'সে নাহয় বুঝলাম, সোনাজারণ খেয়ে তুমি মোটা হয়ে উঠেছো, কিন্তু এই ভীমের মতোন পাথর নিয়ে লোফালুফি, এর মানে কি ?'

আরমান জানালো এ-ও নাকি কুটি কবিরাজের নির্দেশ—শক্তি-ক্ষয় এলাজ। নইলে স্বাস্থ্যের তোড়ে খুব অল্পদিনের ভেতর ওর সামাদুন-দেওলা হয়ে ওঠার কঠিন সম্ভাবনা রয়েছে, তখন আর

কেউ তাকে সামাল দিতে পারবে না, ছনিয়া গায়-গজব হয়ে যাবে।

ঠিক এসময় মাথায় আর পেটে সরষের তেল মাখতে মাখতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো কুটি। আমাকে দেখেই উল্লসিত হয়ে উঠলো। জোর অভ্যর্থনায় বাড়িটাকে কাঁপিয়ে দিতে লাগলো— 'আরে, তুলু, এসো এসো। কী আশ্চর্য, তোমাকেই মনে মনে ভাবছিলাম। তারপর, কেমন আছো, অ্যাঁ। ইলেকশান বনে গেছো যে।'

ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললাম, 'কেন, খুব বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে? চোখ লাল লাল? হু'তিন রাতের অঘুমা?'

'তা অবশ্যি নয়,' কুটি বললো। 'তবে কিছুটা তা-ও বটে।'

গলা থেকে কম্ফর্টারটা খুলতে খুলতে বললাম, 'বয়েস তো ঢের হলো, কবিরাজ, তবু তোমার বদমাইসী গেলো না। মনে হচ্ছে আরমান আলীকে এক-আধ-তোলা সোনাজারণ খাইয়ে দিয়েছো!'

কুটি 'হ্যাঁ' আর 'না'-এর মাঝামাঝি ধরনের শব্দ করে মাথা হেলালো। বললো, 'হতভাগা ক'দিন ধরে খুব ঘ্যানঘ্যান করছিলো। আমি কী করবো!'

'তা বটে। কিন্তু এ আবার কোন্ ধরনের মামদোবাজি, 'আজকাল নাকি রাস্তাঘাট থেকে বেকসুর লোকজন ধরে এনে আটকে রাখছো?'

কুটি এবার অবাক। ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললো, 'এ তুমি কী বলছো, তুলু! খামোকা আমি লোকজনকে ধরে আটকে রাখবো কেন?'

ওর সেই তখনকার ব্যবহার থেকেই কেমন সন্দেহ হচ্ছিলো আমার, আসলে চিঠিটা বোধহয় বোগাস। কেউ ফুর্তি করতে চেয়েছে। এবার ওর কথা শুনে নিঃসন্দেহ হলাম। তবু কুটি কবিরাজ যাতে আমাকে ভুল না বোঝে, সেজন্যে বেনামী চিঠিটা বের করে

ওকে দেখালাম।

ও উল্টেপাল্টে চিঠিটা দেখলো। তারপর গম্ভীর গলায় বললো, 'তোমার সাথে কেউ ফাজলামী করেছে, তুলু। কাউকে আমি আটকে রাখিনি।'

বুকের ওপর থেকে একটা পাষাণ ভার নেমে গেলো। কুটি তাহলে কোন অঘটনে আপাততঃ জড়াচ্ছে না। বারো ঘণ্টায় খুন হয়ে যাবার হুমকিটাও নিছক ভড়কি! খুশি মনে একটা শ্বাস নিয়ে বলি, 'তোমার আরমান আলীকে বলো, কুটি, গরম চা নিয়ে আসুক, আর থাকলে চায়ের সঙ্গে খান-কতোক সেঁকা রুটি আর বুনো মধু।'

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কুটির বাংলোয় আমার নিজস্ব একটা বেড-রুম আছে, অ্যাটাচ্‌ড্‌ বাথ। রুম থেকে বেরিয়েই খোলা বারান্দা। ওখানে দাঁড়ালে উত্তরে ছায়াছায়া খাসিয়া পাহাড় চোখে পড়ে।

বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেলো। স্বপ্নে দেখি, একটা বাবরিঅলা হৃষ্টপুষ্ট জোয়ান লোক আমাকে জবাই করে ফেলছে। বৃদ্ধ বয়েসে এরকম স্বপ্ন হার্টের পক্ষে খুবই মারাত্মক। আমার বুক ধড়ফড় করতে লাগলো। চোখ মেলতেই দেখি কুটি কবিরাজ আমার মুখের কাছে দাঁড়িয়ে আমাকে ঠেলা দিচ্ছে। চপচপে ঘামে আমার গেঞ্জি-টেঞ্জি ভিজে গেছে। লাফিয়ে বিছানায় উঠে বসে বললাম, 'কী, কি ব্যাপার, কুটি, অমন ঠেলছো কেন?'

কুটি ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম, তুলু।'

আমি কুটির মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। ওর মুখের

থেকে সবটুকু রক্ত কে যেন শুষে নিয়েছে। এরই মাঝে কপালে আট-দশটা ভাঁজ ফুটে উঠেছে, গালের চামড়া ঝুলে পড়েছে। বিন্‌বিন্ করে ঘামছে কুটি। বুঝতে প্যারি, ইতোমধ্যে কিছু একটা অঘটন হয়তো ঘটে গেছে। স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করে বললাম, 'কী কথা, কুটি ?'

কুটি এমন এক ধরনের হাসি হাসলো যে ভয়ে আমার রক্ত হিম হয়ে গেলো। বললো, 'তুমি ভয় পাবে না তো, তুলু ?'

আমার গলা দিয়ে শুধু অস্ফুট একটা শব্দ বেরোলো,—অনেকদিন পর এই শব্দ করার ব্যাপারটা নিয়ে কুটি আমাকে খুব ধমকেছিলো, আমি নাকি তখন বলে উঠেছিলাম—কোদাল ! কুটির এই কথাটা আমি বিশ্বাস করিনি, কারণ তখনকার ওই অবস্থায় 'কোদাল' বলার কোন অর্থ হয় ?

তেমনি বিকট নিষ্প্রাণ হেসে বললো ও, 'তোমার বেনামী চিঠির কথাগুলো বোধহয় ঠিক, তুলু। দশদিন আগে দাওয়াং-এর জঙ্গল থেকে একজনকে ধরে আনি আমি আর আরমান। খুব সম্ভব ওটার কথাই চিঠিতে লিখেছে। কই, দাও তো চিঠিটা, দেখি আরেকবার।'

কুটিকে আলনাটা দেখিয়ে দিয়ে বললাম, 'ওই হ্যাঙারে ঝোলান শার্টের পকেট থেকে বের করে নাও।'

ও নীল রঙের চিঠিটা বের করে চোখের সামনে মেলে ধরেই অস্ফুটে বলে উঠলো, 'আশ্চর্য !'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কি ব্যাপার ?'

'এই দেখো !' ও চিঠিটা আমার দিকে এগিয়ে দিলো।

আশ্চর্য ! সবগুলো অক্ষর মুছে গেছে কাগজের পাতা থেকে। এখন সেটা ফক্‌ফক্ করছে। শুধু কাগজটার কোণের দিকে এক বিন্দু

রক্তের দাগ! টকটকে!

ফ্যাস্‌ফেঁসে গলায় বললাম, 'চিঠিটা তাহলে সত্যি। তোমার সব ব্যাপারই অদ্ভুত, কবিরাজ। একটু আগে বললে কাউকে আটকে রাখোনি। এখন আবার বলছো দশদিন ধরে আটকে রেখেছো। তুমি কী, বলো তো। আস্তো একটা ভূত!'

আমি তখন খেপে গেছি, তোড়ে বলতে থাকি, 'যাকে ধরে এনেছো তাকে এক্ষুনি গিয়ে ছেড়ে দেবার বন্দোবস্ত করো। বারো ঘন্টা এখনো পার হয়নি। এখনো খুন হওয়া থেকে প্রাণে বেঁচে যেতে পারো। যাও, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চলো, আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।'

কুটি কবিরাজ অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা গলায় বলে উঠলো, 'সে উপায় নেই, তুলু, তাকে আমি এক হপ্তা আগে খুন করে ফেলেছি।'

আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিমস্রোত বয়ে গেলো শিরশির করে। কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, 'তুমি মানুষ খুন করলে, কুটি? তুমি, তুমি একটা খুনী!'

কুটি বিভ্রান্তভাবে মাথা হেলালো, 'ঠিক মানুষ নয়, তুলু, একটা বাদুড়।'

বাদুড়!—এবার আমার হতভম্ব হওয়ার পালা। বললাম, 'তোমার মাথা ঠিক আছে তো…আবোল-তাবোল বকছো কি না—'

কুটি কবিরাজ অনেকক্ষণ অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো, তারপর মৃদুস্বরে অবিশ্বাস্য এক সন্দেহের কথা শোনালো আমাকে। শুনে আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠলো। কুটি কবিরাজের ভাষ্য এই—

এক অতীব আশ্চর্য আর কার্যকরী ওষুধ তৈরির জন্যে দিন দশেক

আগে আরমান আলীকে নিয়ে ও দাওয়াং-এর জঙ্গল থেকে একটা বড়োসড়ো কালো বাছুড় ধরে আনে। এই বাছুড়ের নখ আর অস্থি-ভস্ম-চূর্ণ দিয়েই ওষুধটা তৈরি করতে হয়। সঙ্গে অবশ্যি এক তোলা মকরধ্বজ আর আধ তোলা সোনাজারণও লাগে। সে গুহ্য ব্যাপার। যাহোক, বাছুড় ধরতে গিয়ে একবার আরমান আলী থমকে গিয়ে বলেছিলো, 'চাচা, কে যেন আমারে ধমক মারতেছে!'

কুটি অবাক হয়ে বলেছিলো, 'সে কি রে ব্যাটা, এখানে আবার কে তোকে ধমক মারতে আসবে!' বলেই তার কেমন যেন খটকা লেগেছিলো। মনে হয়েছিলো, সত্যিই কে যেন বিজাতীয় ভাষায় ধমক-ধামক মারছে। ভালো করে কান পেতে সব শুনে-টুনে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিলো। বাছুড়টাই কিচকিচ করে হৈ-চৈ করছে!

ভুতুড়ে বাছুড় নাকি রে বাবা! কুটি কবিরাজ ভেবেছিলো। বাংলোয় ফিরে একটা খাঁচায় দিন দুই ওটাকে বন্দী করে রেখেছিলো কুটি। তৃতীয় দিনে আরমান আলী ব্লেড দিয়ে চিরে মেরে ফেলে বাছুড়টাকে। বাছুড়টার অস্থি সংগ্রহ করতে গিয়েই আর একবার চমকে উঠেছিলো কুটি, চামড়ার ডানার ভেতর লুকানো অবিকল মানুষের হাতের মতো দুটো হাত, পাঁচটা করে দু'হাতে দশটা আঙুল।

এই ঘটনার পর থেকেই রাতে ভালো ঘুমোতে পারে না ও। আরমান আলী একদিন অভিযোগ করেছিলো, কে বা কারা তাকে এক রাতে সাতটা চড় মেরেছে। পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখে গাল ফুলে ঢোল হয়ে আছে। অবশ্যি আরমান আলীর এ ব্যাপারটাকে কুটি আমল দেয়নি। অই হতভাগা ঘুমের ঘোরে

একবার একটা বেড়ালকে কামড়ে ধরেছিলো ; বেড়ালটা নাকি তার গাল চেটে দিয়েছিলো, তাই।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর কুটি কবিরাজ বললো, 'তোমাকে একটা ব্যাপার দেখাই, তুলু।' বলেই খুব আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো ও। পা টিপে টিপে ঘরের পশ্চিম দিকের বন্ধ জানালা-টার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর নিঃশব্দে জানালা খুলে ধরে একটা বাদাম গাছের দিকে হাত ইশারা করলো।

গাছের ডালে ডালে ঝুলে আছে সাত-আটটা রাক্ষুসে বাদুড়। ছোট ছোট আর নিখুঁত গোল, কালো নিষ্পলক চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আশ্চর্য হিংস্র চোখের চাউনি। শিউরে উঠলাম।

কুটি কবিরাজ জানালাটা আবার বন্ধ করে দিয়ে ঘুরে তাকালো আমার দিকে। তার কপালের ভাঁজ যেন আরো বেড়ে গেছে। আমি বললাম, 'গতিক বড়ো সুবিধের মনে হচ্ছে না, কুটি। বারো ঘণ্টা পার হতে আর মাত্র তিরিশ মিনিট আছে।'

কুটি দু'হাতে মুখ ঢাকলো। আমারও কেমন যেন কাঁপুনি ধরে গেছে। বললাম, 'চলো, পালিয়ে যাই।'

ও অসহায়ের মতো মাথা হেলালো, 'পালানোর পথ নেই, তুলু, বাংলোর চারদিকটা ঘিরে ফেলেছে ওরা।'

ঠিক এসময় রক্ত-হিম-করা ভয়াল আর্তনাদ ভেসে এলো ধারে কাছে কোথাও থেকে। কুটি দৌড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, আমি লাফিয়ে গিয়ে তাকে জাপটে ধরলাম। এক আসুরিক শক্তি ভর করেছে কুটি কবিরাজের দেহে, আমার হাত থেকে মুক্ত হওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে ও। চেঁচিয়ে বলছে, 'আরমানকে ওরা মেরে ফেলছে,

তুলু। আমাকে ছেড়ে দাও—'

এ সময় ঘরের বাইরে আরমান আলীর আশ্চর্য স্বাভাবিক গলা শোনা গেলো, 'কবিরাজ-চাচা, আপনেরা পালিয়ে যান, বাদুড়-গুলানরে আমি দেখতেছি।'

কুটি কবিরাজ চিৎকার দিয়ে উঠলো, 'আরমান, তুই বেঁচে আছিস?'

'হ্যাঁ, চাচা, এখনো বেঁচে আছি, আমার জন্যে চিন্তা করবেন না। আপনারা পেছনের গেট দিয়ে পালিয়ে যান, ওদিকে গাছপালা নাই, বাদুড়ও নাই। তাড়াতাড়ি করেন, চাচা, পঙ্গপালের মতোন বাদুড় আসতেছে।'

শেষের কথাগুলো কেমন যেন থেমে থেমে বলতে থাকে আরমান। লম্বা করে শ্বাস টানার শব্দও শুনতে পাচ্ছি। কিসের থপ্ থপ্ আওয়াজ।

কুটি কাঁপা কাঁপা গলায় হেঁকে বললো, 'এখন আর কোথাও পালাতে পারবো না আরমান, এই ঘরের ভেতরই খিল এঁটে বসে থাকবো। তুই-ও চলে আয়।'

আর একবার সেই রক্ত-হিম-করা আর্তনাদ ভেসে এলো। তার-পর সব কিছু কেমন সুনসান। থপ্ থপ্ শব্দগুলো আস্তে আস্তে মিলিয়ে আসছে।

অনেকক্ষণ পর আমাদের দরজায় ঠুক্ ঠুক্ করে নক্ করলো কেউ। ক্লান্ত চাপা স্বরে কেউ বলে উঠলো, 'দরজা খোলেন, চাচা, আমি আরমান আলী। বাদুড়গুলো চইলে গেছে।'

লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে দিলো কুটি, আর তারপরই বিকট স্বরে চিৎকার দিয়ে পিছু হটতে লাগলো। দরজার বাইরে খুব স্বাভাবিক-

ভাবে এসে দাঁড়িয়েছে এক জ্যান্ত নর-কঙ্কাল। আমার সারা শরীর ঘামে ভিজে যেতে লাগলো।

কুটি ফুঁপিয়ে উঠলো, 'কে, কে তুমি!'

দড়াম করে মেঝেতে পড়ে গেলো আরমানের কঙ্কাল।

রাকারী দ্বীপের রহস্য

বাইরে তখনো সোনালি রোদ্দুরের বিকেল, মিষ্টি আভা ছড়াচ্ছে। আকাশে বাতাসে কী এক ব্যস্ত সুর। আশ্বিনের প্রথমেই শীত শীত আমেজ অথচ শীতও নয়, শুধু শেষ বিকেলের এই মিষ্টি বাতাসে গা-টা কেমন শিরশির করে ওঠে।

জানালা দিয়ে নীল আকাশ দেখা যায়, শিরীষ আর কৃষ্ণচূড়ার ঝিরিঝিরি পাতা সোনালি রোদ্দুর গায়ে মেখে বাতাসে দুলছে। তিনটে চড়ুই কিচির মিচির করে এডালে ওডালে ছুটোছুটি করছে। টুকু অলস ভঙ্গিতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাই দেখতে থাকে।

পাশের ঘরে পড়শী মেয়েরা আসর জমিয়ে বসেছেন। নাম নিয়ে বিতর্ক। স্বাতী আপার ছেলের কি নাম দেয়া যায় তাই নিয়ে আলোচনা। ওর ইতিহাসের অধ্যাপক ভাশুর নাম দিয়েছেন—শাপুর। স্বাতী আপার ও নাম পছন্দ হয়নি। কিন্তু ভাশুরের কথার ওপর কথাও বলতে পারেন না; মহা মুশকিলে পড়েছেন। টুকু শুয়ে শুয়ে শোনে পাশের ঘর থেকে ভেসে আসা টুকরো টুকরো কথাবার্তা,— স্বাতী আপা বলছেন, 'শাপুর তো তবু কম ঝুট-ঝামেলার নাম, ছোট্ট করে শাপু কিম্বা শিপু বলা যাবে, না চাচীআম্মা? জানেন, প্রথমে ভাইজান কি নাম দিয়েছিলেন, আর্দশির! বোঝেন ঠেলা। এই এতোটুকুন বাচ্চার কী ভারী এক নাম। আমি তো ও নাম শুনে প্রায় কেঁদেই ফেলেছি, তখন ভাবীই না হম্বিতম্বি শুরু করলেন ভাইজানের ওপর। শেষে, ভাইজান নরম হয়ে নাম দিলেন শাপুর। বল-

লেন, তাহলে ওই শাপুরই সই, এর হেরফের হলে খুব দুঃখ পাবো, স্বাতী। আমি কী করবো…'

টুকুর যেন আবার ঘুম পায়। মিষ্টি রোদ্দুরের বিকেল মরে আসছে বাইরে। পুজোর তোড়জোড় শুরু হয়েছে এরই মাঝে। মহালয়া গেলো গত বিষুদবারে, মাঝখানে আর মাত্র দু'টো দিন, তারপরই ষষ্ঠি। মণ্ডপ ঘরের ওদিকটা ছোট ছোট ছেলেমেয়েতে সরগরম করে রেখেছে। ধূসর স্মৃতির মতো এক মূর্তি ভেসে ওঠে টুকুর চোখের সামনে, অনাহিতা মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সাসানের ছবি। সাসানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাদের পূর্ব পুরুষ। এই সাসানের পুত্র ছিলেন পাপক। পাপকের দুই পুত্র আর্দশির আর শাপুর অ্যাকামেনিড সাম্রাজ্যের পতনের প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর পর আর্দশির পারস্যে আবার পারসিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। আর্দশিরের সাথে যুদ্ধে পাহ্‌লভ সম্রাট আর্তবনাস পরাজিত ও নিহত হন। আর্দশিরের পুত্র দ্বিতীয় শাপুরও ছিলেন একজন কুশলী নৃপতি। রোমান সম্রাট ভেলেরিয়ানকে পরাজিত করে তিনি হয়ে ওঠেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট…

টুকু চোখ মুদে পড়ে পড়ে ভাবতে লাগলো স্বাতী আপার অধ্যাপক ভাশুর যে শাপুর নাম রাখলেন, সে কোন্‌ শাপুর? প্রথম, দ্বিতীয়, না…

'ওঠ্‌, টুকু, আর কতো ঘুমোবি, সন্ধ্যা হয়ে এলো যে।' আম্মার ডাকে ঘোর কাটে টুকুর। আড়মোড়া ভেঙে বিছানায় উঠে বসে। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতেই বুকটা হু-হু করে ওঠে। ওর মনে হয় সিন্দাবাদের সেই রুক্‌-পাখিটা তার বিশাল ডানা মেলে উড়ে আসছে এই ভুবনছড়ার দিকে, আর তাতেই ভুবনছড়ার

সোনালি রোদ্দুরের আকাশ-মাটি অমন কালো হয়ে গেলো।

এক কাপ কলজে-রঙের চায়ের সাথে দুটো টোস্ট আর একটা নান-কাতাই খেয়ে বেরিয়ে পড়লো টুকু। পশ্চিম আকাশের অনেকখানি ওপরে তৃতীয়ার চাঁদ বাঁকা হয়ে ঝুলে আছে। এবার পুজো আর ঈদ এক সাথেই পড়েছে, লোকজনের ব্যস্ততা তাই একটু বেশি। আগামীকাল থেকে কলেজে পুজো আর ঈদের বন্ধ শুরু হবে, টুকু এখন এই ক'দিন পুরোপুরি ফ্রী। ও এবার ছ'টা লেটারসহ স্টার মার্ক্স্ নিয়ে সায়েন্স স্ট্রিমে এস.এস. সি. পাস করেছে। মুরারীচাঁদ কলেজে আই. এ. ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হলে স্যার-ম্যাডামরা ভীষণ অবাক হয়ে বলেছিলেন, সায়েন্সে এতো ভালো রেজাল্ট করে আর্টস্ নিচ্ছো কেন? সবার একই প্রশ্ন। স্মিত হেসে সবাইকে বলে গিয়েছিলো ও—ভবিষ্যতে ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করতে চাই, আর জার্নালিজ্ম্-এর ব্যাপারেও আমার আলাদা একটা ফ্যাসিনেশান আছে—

উথমার ডাণ্ডিপথ বেয়ে টুকু হাঁটতে থাকে আস্তে আস্তে। ঘেসো-পথ এতোক্ষণে শিশিরে ভিজে উঠেছে। স্যাণ্ডেল পরা পায়ের খালি অংশে ভেজা ঘাসের স্পর্শ লাগছে, সারা গা শিরশির করে উঠছে।

আব্দার্ধার সাতঝোরার বাসায় গিয়ে নিরাশ হলো টুকু, এখনো ঢাকা থেকে ফেরেনি ও, অথচ ভার্সিটি বন্ধ হয়েছে তিনদিন আগে। ফেরার পথে 'গ্রামে ভূতেরা বাস করে'—এই বাক্য দিয়ে একটা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে রজনীফাঁসির কাছাকাছি চলে এসেছে, হঠাৎ মনে হলো চোদ্দ নম্বরের মাটি-কাটা টিলাটার

কাছে কি যেন নড়ছে। ভূত-টুত নয়তো! দূর, ভূতেরা তো গ্রামে বাস করে,—আব্দার্ধা। মহাজনের বাক্যটা আবার আওড়ালো টুকু। ভয় আর কুসংস্কার থেকেই ভূতের জন্ম, আর সেজন্যেই দেখা যায় দারিদ্র্য অশিক্ষা কুশিক্ষায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা গাঁও-গেরামগুলোতেই যতো ভূতের উপদ্রব। পাশ্চাত্যের শিক্ষিত দেশগুলোর লোকজনের ভূত-প্রেতের সাথে পরিচয় শুধুমাত্র বই-কেতাবেই। আমাদের দেশের গৈ-গেরামের লোকজন যখন খালে-বিলে, বাঁশবনে, শ্মশান-মশান, গোরস্থানে আর ঘরের কোণে খালি ভূত-পেত্নীই দেখছে তারা তখন আকাশ কোণে ফ্লাইং সসারের আগমনের আশায় রোমাঞ্চিত। টুকু মৃদু হাসলো। ও ভূতকে ভয় পায় না, কিন্তু ওটা যদি বাঘ-টাঘ হয়। বিচিত্র তো নয়। এই কিছুদিন আগেও ভুবনছড়া তুরুং লাখাটের মতোন অপেক্ষাকৃত নিচু ভূমিতে পাহাড় থেকে বাঘ-ভাল্লুক নেমে এসেছে, দিনের বেলা তারা গরুছাগল আর মানুষের ওপর চড়াও হয়েছে, মানুষ-গরু-ছাগল মেরে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে।

টুকু হাঁক পাড়লো, 'হেই।'

ওখানে কিছু একটা নড়ে উঠলো, মৃদু গোঙানি শোনা গেলো। টুকু বললো, 'কে, কে ওখানে?' সাড়া নেই। দুটো মাঝারি সাইজের পাথর হাতে উঠিয়ে নিয়ে টিলাটার কাছাকাছি এগোলো ও। একটা সরু ল্যাক্‌পেকে লোক ওকে দেখে ডিঙ্গি মেরে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না, ধপাস্ করে পড়ে গেলো মাটিতে। টুকু দৌড়ে গেলো তার দিকে। লোকটার বয়েস হয়েছে প্রচুর। কংকাল-সার শরীর। সাদা দাড়ি-গোঁফ আর চুলে উস্কোখুস্কো মুখের মাঝে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্ছে তার জ্বলজ্বলে চোখদুটি। মণি দুটো যেন

চিতার মতোন জ্বলছে। টুকু বললো, 'কী, কী হয়েছে আপনার? এদিকে কোথায় যাচ্ছিলেন, কোত্থেকে আসছেন?'

এতোগুলো প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সময় খুব সম্ভব নেই, বুঝতে পেরে লোকটা হাত ইশারায় কি বললো, টুকু বুঝতে পারলো না। তখন সে ডানদিকে হামাগুড়ি দিয়ে কি হাতড়াতে লাগলো। টুকু দেখতে পেলো চামড়ার একটা চুপ্সানো ব্যাগ পড়ে আছে ওদিকে। ও ব্যাগটা বুড়োর হাতের কাছে এনে দিলো। ব্যাগের চেইন খোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো বুড়ো। ও খুলে দিলো চেইনটা। অনেক কসরত করে বুড়ো দুটো বিবর্ণ ডায়েরী বের করে টুকুকে ইশারা করলো।

মানে? টুকু অবাক হয়ে ভাবলো, বই দুটো বুঝি আমাকেই দিতে চাইছে। ও লোকটার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, 'কী, কী বলছেন?' লোকটা হতাশভাবে মাথা হেলালো, ঠোঁটদুটো যেন একটু নড়ে উঠলো। বিড়বিড় করে কিছু বলার চেষ্টা করছে সে। টুকু ডায়েরী দুটোর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'আমাকে এগুলো নিতে বলছেন?' কোন প্রত্যুত্তর এলো না।

ঠিক এসময় নিঃসাড় হয়ে গেল লোকটার দেহ—মারা গেছে।

নিস্তব্ধ ডাণ্ডিপথে ডায়েরী দুটো হাতে নিয়ে এক অচেনা বুড়োর মৃত দেহের কাছে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো টুকু। হাতের চেটোর ঘামে ডায়েরী দুটো ভিজে উঠছে আস্তে আস্তে।

ঝামেলা মিটতে মিটতে অনেক রাত হয়ে গেলো। ভুবনছড়ার ডাক্তারবাবু যখন মৃত দেহটা ময়না তদন্তের জন্যে পুলিসের কাছে হাওলা করে দিচ্ছেন, চা-বাগানের পেটা ঘন্টিতে তখন ঢং ঢং করে

বারোটা বাজছে। টুকু আর ওদের বাসার সবাই শুতে গেলো রাত একটার দিকে।

•

ডায়েরীর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হতাশ হয় টুকু। প্রথম ডায়েরী-তে শুধু একরাশ নাম ঠিকানা। অন্তত শ'দেড়েক নাম-ঠিকানা পাতায় পাতায় সাজানো। এ দিয়ে কি করবে টুকু! ও ভেবেছিলো গল্প বইতে যেমন পড়ে, রহস্যময় ডায়েরীর পাতায় পাতায় থাকবে রোমাঞ্চের ছড়াছড়ি, গুপ্তধনের কথা, তা নয়,—মানচিকি তাকাওসু, উনষাট/বি ইয়াসুনারী স্ট্রীট, কিউস্থ; ইভান মাকারেঙ্কো, এক শূন্য শূন্য আট, দনেস্ক সায়েন্স বিল্ডিং; পুম্বা ফাদি, লাওস; ইসাক আমেদ, বত্রিশ পুকারো, তিউনিসিয়া; জব্বার সিকদার, এইচ বাই বারো গুল্‌ খাঁ লেন—হেনো তেনো রাশি রাশি নামের ছড়াছড়ি। হোপ্‌লেস্‌!

দ্বিতীয় ডায়েরী খুলেও বোকা বনে গেলো টুকু। পাতার পর পাতা একদম সাদা, একটা কালির আঁচড়ও নেই। বিবর্ণ হলদেটে পাতায় কেমন পুরনো পুরনো গন্ধ। লোকটা পাগল নাকি। আদৌ ডায়েরী লিখতো কিনা এখন তার সন্দেহ হচ্ছে।

পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ডায়েরীর শেষের দিকটায় এসে টুকু একটা লম্বা শ্বাস ফেলে। হ্যাঁ, শেষের দিকের বেশ ক'টি পাতা নীল কালির ঠাশ-বুনানি লেখাতে ভরতি। ওর এতোক্ষণের হতাশ চোখে এবার বিস্ময়ের সমুদ্র চিকচিক করে ওঠে। কী লেখা আছে এতে!

বুঝতে পারে, একজন বিখ্যাত লোকের ঠিকানার কথা লেখা আছে ডায়েরীটাতে, খুব সম্ভব ঠিকানাটা লোকে যাতে জানতে না পারে সেজন্যে বুড়োর এতো সাবধানতা।

টুকু এবার ডায়েরীর মূল লেখায় ফিরে যায়। পড়তে পড়তে তার চোখ-দুটি চমক খাওয়া বিস্ময়ে এলোমেলো হয়ে যায়। এ কেমন করে হয়। এ অসম্ভব, অসম্ভব—

একটা রহস্যময় দ্বীপে কয়েকদিনের অভিজ্ঞতার কথা দিন-তারিখ দিয়ে ডায়েরীতে লিখে রেখে গেছে লোকটা।

রৌদ্রগন্ধী চিলের ডানায় ভর করে দুপুর গড়ায়। গুটি-বাড়ির উত্তরের দেবদারু বনে একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ডায়েরী পড়তে পড়তে টুকু শুনতে পায় সাগরের গর্জন, সাদা ফেনার ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে। টুকু যেন রহস্যময় বিজন দ্বীপের বালুকা বেলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে অস্পষ্ট ভূতুড়ে গলায় কে গাইছে—

ওহে রোহ্‌তাস,
দিনে দিনে দরিয়ার ফেনাও শুকিয়ে যায়
কিন্তু কই, কেউ তো মনে রাখে না...

রুকারী দ্বীপ, ১১ অক্টোবর

মজার ব্যাপার হচ্ছে এই, যে, অনেক চেষ্টা করেও সেই বিশেষ শব্দ-টা মনে করতে পারছিলাম না। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে প্রফেসরকে বললাম কথাটা। উনি হাসতে হাসতে তাঁর নোট বুকের এক কোণে পেন্সিল দিয়ে বাঁকা অক্ষরে লিখলেন—এল এ ওয়াই এম এ এন। আমি বিষণ্ণ গলায় বললাম, 'তাই। লেম্যান-ই। প্রফেসর, আপ-নার ওই ডায়েরী-টাইরি লেখা আমার দ্বারা হবে না, মাফ করুন। বান্দা এ ব্যাপারে একদম লেম্যান। ওসব ছাইপাঁশ একচ্ছত্র লেখার ক্ষমতা আমার নেই।'

প্রফেসর বললেন, 'আমি তো আপনার চেয়েও আকাট-মূর্খ। আচ্ছা আসুন, এক কাজ করা যাক, ওই সূর্য অস্ত যাওয়া নিয়ে আপনি একটি শুদ্ধ বাক্য রচনা করুন, আমিও করি। যার বাক্য ভালো হবে সে-ই ডায়েরী লিখবে।'

আমার চেয়ে বাজে যাতে প্রফেসর লিখতে না পারেন সে জন্যে অনেক মাথা ঘামিয়ে লিখলাম—কেরোসিনের মতো উত্তাল সাগরের নোনাজলে মাংস রঙের সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে তড়িৎ গতিতে।

ওদিকে প্রফেসর লিখেছেন—সাগরের পানি সূর্যকে খাইয়া ফেলিলো। দু'জনের বাক্য তুলনা করে প্রফেসর রায় দিলেন, 'সাকলায়েন, আপনার বাক্যটাই বেটার, বেখাপ্পা উপমা বসিয়েছেন যদিও, তবু খাঁটি কথা বলতে হয়, ওই বেখাপ্পা উপমা দিয়েই মেরে দিয়েছেন আপনি। আমি হেরে গেলাম।'

(শালার ব্যাটা প্রফেসর, ভাবছো তোমার চালাকি আমি বুঝিনি!) যা'চ্চলে, কী লিখলাম। প্রফেসর যদি দেখে ফেলেন এই শ্যালক সম্বোধন। কেটে দেবো? না থাক। এ পাতাটা প্রফেসরকে না দেখালেও চলবে।

তো, ব্যাপার হলো, ওই বাক্য রচনার পর প্রফেসর সুদৃশ্য ডায়েরীটা বের করে দিয়ে বললেন, 'এই নিন, এখন থেকে এটা আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আপনার ডায়েরীর ব্যাপারে আমি কোন কৌতূহল দেখাবো না। কী, এবার খুশি তো!'

টুকু ডায়েরীর পাতা থেকে চোখ সরিয়ে দূরের ঝাপসা পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে রইলো কতোক্ষণ।

এখন রাত ন'টা। প্রফেসরের ডিজিটাল ঘড়ি তো তাই-ই বলছে। কতো যুগ আগের এক পুরনো দালানের সন্ধান পেয়েছেন

প্রফেসর এই দ্বীপের মধ্যিখানে। আজ সারাদিনে আমরা ভাঙা দালানের ফটকের দিকের দু'রূম বসবাসের উপযোগী করে তুলেছি। খাটুনি গেছে সাংঘাতিক। বালু বেলায় এখন নেতিয়ে পড়ে আছেন প্রফেসর। সারাদিনের খাটাখাটনির শেষে সন্ধ্যার দিকে পেট ভরে কচ্ছপের ডিম খেয়েছি আগুনে পুড়িয়ে। এ-দ্বীপে কচ্ছপ আছে প্রচুর, আর কাক। দাঁড়কাক। দ্বীপে প্রথমদিন নেমেই দেখেছি সাগরের বেলাভূমি থেকে অনেকদূরে ঝাপসা নীল জঙ্গল। বড়ো বড়ো গাছে শ্যাওলা ধরে আছে, আর গাছের ডালে ডালে বাসা বেঁধেছে অজস্র দাঁড়কাক। প্রফেসর অনুমানেই বললেন, 'দ্বীপটা বেশি বড়ো নয়। আর বিজন। মানুষ জনের পা পড়েনি এ জায়-গাটায়। দেখেছেন, সাকলায়েন, কেমন নিস্তব্ধ এখানটা, পাখি-টাখিও কম।' প্রফেসর তীক্ষ্ণ চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার বললেন, 'আপনি লক্ষ্য করেছেন, সাকলায়েন, কতো কাক এখানটায়। ঐ দ্বীপের নাম দেয়া যাক রূকারী দ্বীপ, কি বলেন?'

আমি বললাম, 'চমৎকার নাম।'

প্রফেসর শুয়ে শুয়েই একটা এক ইঞ্চি ডায়ামিটারের চুরুট ধরিয়ে-ছেন। আসলে এখানে চুরুট পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, গতকাল বিকেলের দিকে বনের ভেতর থেকে প্রায় তিরিশ ফুটের মতোন লম্বা কী এক জংলী লতা কেটে এনেছেন। আমি তখন আমার মাইক্রো-সনোফোনটা সারিয়ে তুলতে ব্যস্ত। এই দ্বীপে এক ধরনের প্রজাপতির সন্ধান পেয়েছি, যারা খুব সম্ভব গান গাইতে পারে। মাইক্রো-সনোফোনটা সারিয়ে তুললেই আমার অনুমানের সত্য-মিথ্যা যাচাই হয়ে যাবে। এই বিরাট লতা দেখে আমি অবাক হলাম। প্রফেসর বললেন, 'সাকলায়েন, দেখে রাখুন, এই আমার চুরুট, সারা জঙ্গল

চুঁড়ে লতাটা খুঁজে বের করেছি। কই, ছুরিটা দিন তো।' তারপর তিনি লতা থেকে চার ইঞ্চি লম্বা দুটো টুকরো কেটে একটা আমাকে ছুঁড়ে দিলেন, নিজে একটার মাথায় আগুন ধরিয়ে তৃপ্তিভরে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। আমি আমার টুকরোটায় আগুন ধরিয়ে টান দিতেই চক্কর দিয়ে উঠলো মাথা। বুঝলাম দারুণ কড়া লতাটা। প্রফেসর চোখ মুদে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'চুরুট হিসেবে এর জুড়ি মেলা ভার, আমি সেন্ট্রাল আফ্রিকার এক জঙ্গলে বেশ ক'মাস ছিলাম। বুম্বাবুম্বা নামে ওখানকার এক জংলী আমাকে শিখিয়ে দেয় এ-ধরনের বুনো চুরুট খাওয়া।'

আমি বললাম, 'প্রফেসর, আপনার এই চুরুট আমার জন্যে নয়, খুবই কড়া!'

প্রফেসর আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বললেন, 'ঠিক আছে, এর পর জঙ্গলে ঢুকলে আপনার জন্যে আরো মাইল্ড চুরুট লতার খোঁজ করবো।'

আরে, প্রফেসর হঠাৎ তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন যে! কান পেতে কি শুনছেন তিনি। কী, কী বলছেন? মানুষের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে, আর,··· আরে, সত্যিই তো, দ্বীপের মধ্যিখানে আমাদের অবিষ্কার করা সেই কোন রূমে যেন হলুদ আলো জ্বলে উঠেছে! প্রফেসর আমাকে বলছেন তাঁর সাথে যাওয়ার জন্যে। ডায়েরী আপাততঃ বন্ধ রেখে প্রফেসরের সাথে যাচ্ছি হলুদ আলোর উৎসের দিকে।

১২ অক্টোবর। দুপুর।

আজকে আমার অবসর প্রচুর। ভোরের দিকে দালানে এসে বসত

গেড়েছি আমরা। আজও ব্রেকফাস্ট সারলাম কচ্ছপের ডিম দিয়ে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বেশ খুঁতখুঁতে হয়ে উঠেছেন প্রফেসর। ভোরে বললেন,'নাহ্, এভাবে খাওয়া-দাওয়া করলে তো মরে যাবো দেখছি। সাকলায়েন, একটা কিছু করতে হয়, তাই না।' এরপর তিনি পাখি ধরার ফাঁদ আর মাছ মারার ছিপ-বড়শি বানাতে লেগে গেছেন। সারা সকাল থেকে তাঁর ঠুক্‌ঠাক্ চলছে। রাক-স্যাক থেকে তাঁর প্রিয় স্কালপেলটা আর দুটো সিরিঞ্জের নিড্‌ল্ উঠিয়ে নিয়েছেন তিনি। প্রফেসর এক সময় বাইরে থেকেই হাঁক দিয়ে বলেছিলেন, 'সাকলায়েন, ইতুরি রেইন ফরেস্টের সেই চিতাধরার ফাঁদ বানানোর কলাকৌশল দেখছি কাজে লেগে গেলো। আজ রাতে দেখবো আপনি কেমন বাবুর্চি, বন মোরগের ভুনা রাঁধার জন্যে জংলী মশলা-পাতির যোগাড়ে লেগে যান।' এর পর আর তাঁর সাড়াশব্দ পাইনি। প্রফেসরের ফিরতে দেরি হবে। মওকা যখন পেয়েছি তখন গত কয়েকদিনের ঘটনাবলী লিখে রাখতে বাধা কোথায়? তার আগে অবশ্যি প্রফেসরের পরিচয়টা—

একথা বলতে বাধা নেই যে, প্রফেসর হচ্ছেন এই সাব-কন্টিনেন্টের একজন নামকরা সার্জন। শুধু সাব-কন্টিনেন্টই বা বলি কেন, সার্জারীতে সারা পৃথিবীতে তাঁর সমকক্ষ কেউ আছে বলে আমি মনে করি না। প্রফেসরের নাম বলবো না, বললেই তো যে কেউ চোখ কপালে তুলে বলবে, আরে, উনিই সেই সার্জন···। আর, তাছাড়া পৃথিবীর চোদ্দটি দেশের গোয়েন্দা সংস্থা তাঁর পেছনে ফেউ-এর মতো লেগে আছে, কাজেই—

ভারতের এক নামকরা মেডিক্যাল কলেজের সার্জারী প্রফেসর তিনি। সেখানে প্রফেসরের ঢিলেঢালা কাজকর্মে ছাত্র-ছাত্রীরা

তাঁর নাম দিয়েছিলো ঠেলাগাড়ী-সার্জন। একবার এক অতি সাধারণ গ্যাস্ট্রো-জেজুনোস্টমীতে আড়াইঘণ্টা সময় লাগিয়ে দিয়েছিলেন।সেই তখন কে এক ইন্টার্নী বিরক্ত হয়ে বলেছিলো শম্বুকগতি প্রফেসর। আসলে এসবই ছিলো তাঁর চালবাজি। কেউ যাতে বুঝতে না পারে যে এই আন-স্কীল্ড্ প্রফেসরই বিখ্যাত সার্জন …। নিউরো-কিউবারনেটিক্স-এ অগাধ জ্ঞান প্রফেসরের। নিউরো-সার্জারীতে লাভ করেছেন ঈর্ষণীয় সাফল্য। ওপেন হার্ট সার্জারী-তেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

আর আমি? ছিলাম তড়িৎ প্রকৌশলী, সখের বশে হয়ে গেলাম জীব-বিজ্ঞানী।গ্র্যাজুয়েশান নিই ক্যালিফোর্নিয়ার বার্ক্লে থেকে। তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তির ক'টি মৌলিক ধারণার জন্যে খুব অল্পসময়ের ভেতরই প্রফেসর হিসেবে নাম করে ফেলি। ঠিক এসময় ঝুঁকে পড়ি জীব-বিজ্ঞানের দিকে। এই সাবজেক্টের নেশায় মধ্যআফ্রিকার জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। ঘুরে বেড়িয়েছি জাভা সুমাত্রার ট্রপিক্যাল অঞ্চলে, ব্রাজিলের রেইন-ফরেস্টে, আন্দিজ আর হিমালয় রেঞ্জে, আসাম আর বর্মা-মল্লুকে। ঘুরতে ঘুরতে কেমন করে যে একদিন প্রফেসরের সাথে ভিড়ে গেলাম, সে-ও এক গল্প। তবে সে-গল্প এখন না।

নতুন ধরনের একটা এক্সপেরিমেন্টের জন্যে প্রফেসর ভারত মহাসাগরের একটা দ্বীপ বেছে নিয়েছিলেন। আমাদের যাত্রা শুরু হয় পয়লা অক্টোবর সিবেলিস থেকে। শক্তিশালী ডাবল ইঞ্জিন আর এক্সট্রা-টারবাইনযুক্ত ইয়ট সালাউদ্দীনকে নিয়ে প্রফেসরের গর্ব ছিলো খুব। আটই অক্টোবর ভোর পাঁচটার দিকে প্রচণ্ড ঝড়ে প্রাইম মেরিডিয়ানের ৮৩°৪৫´ ইস্ট লঙ্গিচ্যুড এবং ২০°১৭´ নর্থ

ল্যাটিচ্যুড-এ ইয়ট সালাউদ্দীন ডুবে গেলো। বারোজন যাত্রীর সবাই অবশ্যি লাইফ-বয়া নিয়ে সাগরে নেমে পড়তে পেরেছিলো। ইয়টের সাথে সাথে প্রফেসরের মিনি ল্যাবরেটরিটাও ডুবে গেলো। শুধু একটা রাক-স্যাক্-এ কিছু খাবার আর কতোকগুলো জিনিস-পত্র ভরতে পেরেছিলেন। আমি আর প্রফেসর একই বয়ায় উঠে-ছিলাম। সঙ্গী-সাথীরা কে কোথায় যে ভেসে গেলো। ভাসতে ভাসতে দশই অক্টোবর দুপুরের দিকে এই অচেনা দ্বীপে এসে ভিড়-লাম। সাথীদের জন্যে খুবই চিন্তিত ছিলাম। প্রফেসর বললেন, 'ভয় নেই সাকলায়েন, ওরা ঠিকই কোন না কোন দ্বীপে ভিড়ে গেছে আমাদের মতো। আমার মনে হয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরো অনেক দ্বীপ রয়ে গেছে এদিকে, ওরা ডাঙা পেয়ে যাবে, দেখবেন।'

একটা ব্যাপার দেখেছি, খুব বড়ো বিপদের মাঝেও প্রফেসর হাসিখুশি থাকতে পারেন। কঙ্গোর আউআউ জাতের একদল জং-লীর হাতে একবার ধরা পড়ে গিয়েছিলাম আমরা। মানুষের মাংস খাওয়ার খুশিতে জংলীদের সে কী উদ্দাম নাচ-গান! মনে পড়ে, ভয়ে আমার কলজে শুকিয়ে আসছে, হাত-পা বাঁধা। এরই মাঝে সেই বিখ্যাত হাঁক পাড়লেন প্রফেসর, সাকলায়েন, দেখুন, দেখুন, এই জংলী নৃত্যের আর্টটা! তাণ্ডব-নৃত্যে শালারা কেমন চমৎকার বশর্তারী-স্বস্তিকা ব্যবহার করছে, প্রতি তিন তরঙ্গে একবার আবার স্বস্তিকার মুদ্রা বদলও, তার জায়গায় কটকবর্ধন, ব্যাটারা করছে কী! এতো সূক্ষ্ম মুদ্রা আর মাত্রাজ্ঞান শিখলো কোত্থেকে! আমি তিক্ত সুরে বলেছিলাম, 'প্রফেসর, এদের এ কটক-বর্ধন, আপনাকে খাওয়ার জন্যে, আপনার রাজ্যাভিষেকের জন্যে নয়।'

উনি হা হা করে হেসে বললেন, 'সে যাই হোক, নাচে কিন্তু

এরা চমৎকার, তোড়ে ঝংঘটের মাঝেও এই যে এই ধ্রুপদী কারু-কাজের চেষ্টা, এটার তারিফ না করে পারা যায় না। তাছাড়া সাক-লায়েন, ভারতীয় নাচের আর্টও এরা জানে দেখছি! একটা অনু-সন্ধান চালিয়ে যদি…।'

অমন সাধের ল্যাবরেটরি আর সাথীদের হারানোর পরও তাঁর সেই হাসিখুশি ভাব মিলিয়ে যায়নি। সকাল বিকাল নিয়মিত ব্যায়াম করছেন, বাচ্চা ছেলেদের মতোন নেংটো হয়ে সমুদ্রে স্নান করছেন। এক দুপুরে তো আমাকে বলে বসলেন, 'আসুন সাক-লায়েন, আপনাকে গাছে চড়া শিখিয়ে দেই।' আরেক বিকেলে কোত্থেকে দৌড়ে এসে আমাকে বললেন, 'জলদি শার্ট খুলুন!' আমি তো হতভম্ব। আমার পরনে লাল শার্ট ছিলো, প্রফেসর এক রকম জোর করেই শার্টটা খুলে নিয়ে একটা লম্বা ডালের সাথে বেঁধে দিলেন, তখন ওটাকে দেখাতে লাগলো জলদস্যুদের পতাকার মতোন। প্রফেসর আমাকে বললেন, 'চলুন।' বেলাভূমির কাছে একটা উঁচু ঢিবিতে ঝাণ্ডাটা গেঁথে দিলেন তিনি, বললেন, 'কতো-দিন এ দ্বীপে আটকা পড়ে থাকতে হবে কে জানে, কোন জাহাজ এদিক ক্রস করতে গেলে দূর থেকে ওটা দেখে আমাদের উঠিয়ে নিতেও পারে।' লাল ঝাণ্ডাটা তখন পত্‌পত্‌ করে উড়ছে।

'ওহ্ হো, একটা ব্যাপার লিখতে ভুলে গেছি—গত রাতের সেই হলুদ আলো আর মানুষের কণ্ঠস্বর! আসলে মজার ব্যাপার হচ্ছে ওই হলুদ আলো, আলোটা দেখে আমরা অবাক হয়েছিলাম, কাছে গিয়ে দেখি শ'য়ে শ'য়ে জোনাকপোকা দালানের উত্তরের ঝোপটার মাঝে জটলা পাকাচ্ছে, সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য! ময়লার ভেতর ম্যাগট যেমন দলা পাকায় জোনাকগুলোও তেমনি ঝোপের ভেতর

কিলবিল করছিলো। কণ্ঠস্বরের ব্যাপারে অবশ্যি কোন সুরাহা হলো না। প্রফেসর শেষে সিদ্ধান্ত টানলেন, এটা শেয়ালের কাজ। হুস্-হাস্ করে একটা ধূসর শেয়াল কিছুক্ষণ আগে আমাদের পায়ের ওপর দিয়ে পাশের জঙ্গলে ছুটে পালিয়েছিলো।

এখন দুপুর বারোটা। প্রফেসর এখনো ফিরলেন না। কী করা যায়? বেরিয়ে পড়বো নাকি তাঁর খোঁজে?

১২ অক্টোবর। রাত।

এক অবাক কাণ্ড ঘটেছে আজ। তাই আবার ডায়েরী নিয়ে বসতে হলো। ব্যাপারটা লিখে না ফেললে স্বস্তি পাচ্ছি না। আমরা কি নূতন কোন বিস্ময়ের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি?

দুপুরে প্রফেসরের খোঁজে বেরিয়ে তো পড়লাম। মনে মনে ভাবছি কোনদিক দিয়ে যাওয়া যায়, হঠাৎ দেখি দূরে পুবের বেলা-ভূমি ধরে হেঁটে আসছেন প্রফেসর। আশ্চর্য, ধূ-ধূ বেলাভূমিতে পাখি শিকারে বেরিয়েছিলেন নাকি প্রফেসর?

কাছাকাছি আসতেই প্রফেসর বললেন, 'চলুন, সাকলায়েন, এ-দ্বীপে মানুষ আছে বোধহয়, একটু খুঁজে দেখি।'

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, 'মানুষ! এই দ্বীপে!'

প্রফেসর গম্ভীর গলায় বললেন, 'মানুষের গলাই তো মনে হলো, আমি অবশ্যি চোখে দেখিনি। সাকলায়েন—' প্রফেসর আমাকে এমন স্বরে ডাকলেন যে, আমি রীতিমতো ভড়কে গেলাম। বললেন তিনি, 'পাখি-টাখি ধরা হয়ে ওঠেনি সাকলায়েন, চারঘণ্টা ধরে আমি ওই কণ্ঠস্বরের মালিককে খুঁজে ফিরছি, স্পষ্ট শুনেছি পুবের বেলাভূমিতে অথবা জঙ্গলের ভেতর গান গাইছে কেউ, অথচ পেলাম না কাউকে! চলুন তো দু'জনে।'

আমি বললাম, 'গত রাতে আমরা তাহলে ভুল শুনিনি। প্রফেসর, এমন তো হতে পারে যে কণ্ঠস্বরটা আমাদেরই সঙ্গী-সাথীদের কারো!'

প্রফেসর বললেন, 'আমারও তাই ধারণা। ভালো কথা সাকলায়েন, আগুন জ্বালাতে গিয়ে দেশলাই-এর কাঠি বেশি বেশি খরচ করে ফেলবেন না যেন, আরো কতো দিন এ-দ্বীপে থাকতে হবে কে জানে। আগুন খুইয়ে বসলে বড় কষ্ট হবে।'

আমি ভাবলাম, আগুনের কথা কেন বললেন প্রফেসর। সাগরের উত্তাল ঢেউ তীরে এসে আছড়ে পড়ছে, হু হু বাতাসে আমাদের চুল উড়ছে। কিছুদূরে চলে এসেছি, হঠাৎ শুনি—

ওহে রোহ্‌তাস,
দিনে দিনে দরিয়ার ফেনাও শুকিয়ে যায়
কিন্তু কই, কেউ তো মনে রাখে না...

আমার সারা গা শির্‌শির্‌ করে ওঠে। আমাদের আশেপাশেই কেউ ভূতুড়ে গলায় গান গেয়ে উঠেছে!

প্রফেসর বললেন, 'ওই, ওই শুনুন, সাকলায়েন! গানের সুরটা ওই জঙ্গলের দিক থেকেই এলো বোধহয়।'

আমি বললাম, 'উঁহু, শব্দটা এসেছে ওই বড়ো গাছটার পেছন থেকে। বিশাল ধড়অলা একটা নিঃসঙ্গ রেন-ট্রি বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। শুধু তার পাতাগুলো বাতাসে দুলছে। কেউ যদি ওই গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকে তো তার পালাবার পথ নেই।' প্রফেসরকে বললাম, 'আপনি এখানে দাঁড়ান, আমি দৌড়ে গিয়ে গাছের ওদিকটা দেখে আসছি, তারপর দুজনেই গিয়ে বনে ঢুকবো ওকে খুঁজতে।'

গাছের আড়ালে কেউ ছিলো না। আমরা দু'জন আঁতিপাঁতি করে জঙ্গলটা চুঁড়ে বেড়ালাম, সাগরের পাড় ধরে দ্বীপের পুব আর দক্ষিণ অংশও ঘুরে ঘুরে দেখলাম—কেউ নেই।

সাঁঝের সামান্য আগে দ্বীপের পশ্চিম দিক দিয়ে আস্তানায় ফিরে চললাম ক্লান্ত অবসন্ন পা টেনে টেনে। ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করছে, সারাদিনে পেটে পড়েছে শুধু কয়েক আঁজলা ঝরনার জল। দুটো কাছিম হাতে উঠিয়ে ফিরছি দুজনে, আজ কাছিমের মাংস খাবো আগুনে ঝল্‌সে।

অস্তগত সূর্যের রাঙা আভায় চারদিক রাঙা হয়ে উঠেছে, আকাশে ছেঁড়াখুঁড়া রাঙা মেঘ। আস্তানায় ফিরতে ফিরতে শুনি সাগর তীরে আছড়ে পড়ছে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ, হু হু বাতাসে যেন সেই বিষাদ মলিন সুর—ওহে রোহ্‌তাস···

১৪ অক্টোবর। রাত।

একটা ভয় যেন আস্তে আস্তে ঘিরে ধরছে আমাদের। বিক্ষিপ্ত চিন্তায় গত দু'রাত ঘুমোতে পারিনি। দিনের বেলা ঘুরে বেড়িয়েছি সেই ভূতুড়ে কণ্ঠস্বরের সন্ধানে। এই দু'দিনে এবং রাতের অনেকখানি সময় আমরা টহল দিয়ে ফিরেছি সারা দ্বীপ—কোথাও একটা মানুষ চোখে পড়েনি। আজ সারাদিন আমরা হাঁক-ডাক আর হৈ-হল্লা করে দ্বীপটিকে সরগরম করে রেখেছিলাম।

বুদ্ধিটা আমারই, এখানে আমরা ছাড়া অন্য কেউ যদি থেকে থাকে তাহলে আমাদের হল্লা তাদের কানে পৌঁছোবেই। কারো সাড়া মেলেনি। বিকেলের দিকে যখন প্রফেসর ফাটলের ভেতর থেকে তাঁর ছিপে গেঁথে তুলেছেন এক বিরাট সামুদ্রিক বাইন, ঠিক

তখনই শুনতে পাই আমার ঘাড়ের কাছে সেই ভূতুড়ে স্বর—

আর জেনে রাখো

হেকিম জুবায়েরের সহকারী দুশো বছর ধরে

এই দ্বীপে বেঁচে আছে…

প্রফেসর খুব ধীরে ধীরে পুব দিকে ঘাড়টা ঘোরালেন, তড়িৎ গতিতে ঘুরে দাঁড়ালাম আমিও, কেউ নেই! অথচ স্পষ্ট শুনেছি লম্বা করে শ্বাস টানার শব্দ আর ওই কথাটা। আস্তানায় ফিরতে ফিরতে প্রফেসর গম্ভীর গলায় বললেন, 'ভূত আমি কোনদিনই বিশ্বাস করি না সাকলায়েন, অথচ এ রহস্যের কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাও খুঁজে পাচ্ছি না।'

লবণ শেষ হয়ে গিয়েছিলো, তাই আস্তানায় ফিরে প্রথমেই লবণ তৈরিতে লেগে গেলাম। প্রফেসর স্কালপেল দিয়ে মাছটার ছাল ছাড়াতে আর কাটিকুটি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন—ঠিক এসময় কানে এসে আছড়ে পড়লো দুরাগত বিষণ্ন গলার গান—ওহে রোহ্-তাস…

তখনি লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়োলেন প্রফেসর, তাঁর পেছন পেছন আমিও। রাত ন'টা পর্যন্ত খুঁজে বেড়ালাম রহস্যময় লোকটাকে। পুবের বেলাভূমিতে, যেখানে নিঃসঙ্গ রেন-ট্রিটা হুহু বাতাসে দোলা খায়, শুনলাম ওদিক থেকে ভেসে এলো গানের সুর। আমরা দৌড়ে গিয়ে ওখানে কাউকে পাইনি।

দালানে ফিরে দেখি একটা ধূসর শেয়াল আমাদের সাধের বাইনমাছটা মুখে করে দৌড়চ্ছে। প্রফেসর খেপে গেলেন। বললেন, 'সাকলায়েন, খিদেয় পেটের ভেতর নাড়ীভুঁড়ি পাক খাচ্ছে আর ওই হতভাগা মাছটা নিয়ে গেলো। আসুন, ওই শেয়াল দিয়েই

আজ রাতের ভোজ হবে।'

প্রফেসরকে বাধা দিয়ে তাঁর জেদই শুধু বাড়িয়ে দিলাম, আটকাতে পারলাম না। শেষে দু'জনে দুটো মোটা মোটা গাছের ডাল হাতে নিয়ে শেয়াল শিকারে বেরোলাম।

গভীর রাতে যখন শেয়ালের টাটকা মাংস নুন ছড়িয়ে ঝল্‌সে খাচ্ছি তখন আমাদের কানে এসে আছড়ে পড়ছে সেই দূরাগত বিষাদমাখা গানের সুর, বাতাসের হু হু কান্না, সাগরের গর্জন।

মোমবাতি জ্বালিয়ে যখন আমি ডায়েরী লিখতে বসছি, প্রফেসর তাঁর চিরাচরিত হাঁকটা পাড়লেন, সাকলায়েন, ইনশাল্লাহ্‌, কালই হেকিম জুবায়েরের সহকারীকে খুঁজে বের করে ফেলবো।

১৫ অক্টোবর। সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা।

প্রফেসরের মতিগতি বোঝা যাচ্ছে না। কেমন চুপ মেরে গেছেন তিনি। কেউ যেন আঠা দিয়ে তাঁর ঠোঁট দুটি জোড়া লাগিয়ে দিয়েছে। পুবের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকা নিঃসঙ্গ রেন-ট্রির ছায়ায় বসে সারাটা দিন কাটিয়ে দিয়েছি। সন্ধ্যার দিকে একবার আস্তানায় ফিরেছিলাম। ওখানে আমাদের অক্ষয় চুলোয় আগুন জ্বলছে। চট্‌পট্‌ দশটা কচ্ছপের ডিম পাতায় মুড়ে পুড়িয়ে নিলাম। এখন আবার ফিরে চলেছি বেলাভূমির দিকে। প্রফেসর মুখ খুলেছেন এতোক্ষণে, চিৎকার করে বলছেন, 'আপনার ডায়েরী আজকের জন্যে বন্ধ রাখুন তো সাকলায়েন, তৈরি হয়ে যান খুব বড়ো ধরনের একটা বিস্ময়ের ধাক্কা সামলানোর জন্যে!'

১৫ অক্টোবর। রাত পৌণে বারো।

কাকে অবিশ্বাস করবো, আমার কানকে? আমার চোখকে? সন্ধ্যার

দিকে প্রফেসর বলেছিলেন একটা বড়ো ধরনের বিস্ময়ের ধাক্কা সাম-লানোর জন্যে তৈরি থাকতে—

আমি সে ধাক্কা সামলাতে পারিনি। খুব সাদামাঠা ভাবে এখন আমি যা বলবো তা শুনে যে কেউ-ই চমকে উঠবে—নিঃসঙ্গ রেন-ট্রি-টাই বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে অমন ম্লান ভূতুড়ে গলায় গান গায়।

আমি আর লিখতে পারছি না।

১৬ অক্টোবর। রাত।

আজ সারাদিনে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হলাম—রেন-ট্রি-টাই অমন করে গান গায়, কথা বলে।

হেকিম জুবায়েরের সহকারীর ভূতই কী ওই গাছে আস্তানা গেড়ে থাকে? আমার প্রশ্নের উত্তরে মাথা হেলিয়েছেন প্রফেসর। বলেছেন, 'ভূত কোত্থেকে আসবে, ভূত বলে কিচ্ছু নেই, সাকলায়েন।'

আমার বিস্ময় তখন থ্রেশল্ড-লেভেল অতিক্রম করেছে। বললাম, 'কী অদ্ভুত কথা প্রফেসর, আমাকে আপনি কোনমতেই বিশ্বাস করা-তে পারবেন না যে গাছ গান গাইতে পারে,' বলেই প্রফেসরের দিকে তাকালাম।

প্রফেসর চিন্তিত গলায় বললেন, 'সাকলায়েন, এমুহূর্তে আমি অন্য এক সম্ভাবনার কথা চিন্তা করছি।'

তাঁর সম্ভাবনাটা কী, আমাকে জানাননি প্রফেসর। শুধু কি যেন চিন্তা করতে করতে এক সময় বললেন, 'আগামীকাল ভোরে এ রহস্যের একটা সমাধান পেয়ে যাবো আশা করছি।'

১৮ অক্টোবর। দুপুর।

কোন চিন্তাই খেলছে না মাথায়। এই কিছুক্ষণ আগে জেনেশুনে

ঠাণ্ডা মাথায় একটা মানুষকে খুন করেছেন প্রফেসর। এই খুনের মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বকালের আশ্চর্যতম ঘটনার সমাপ্তি না শুরু, বুঝতে পারছি না। আমার পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে আড়াইশো-তিনশো বছরের পুরনো বিশাল ধড়অলা রেন-ট্রিটা। গাছটাকে ধসিয়ে দিতে পুরো দেড়দিন লেগেছে আমাদের। প্রফেসর তাঁর সেই ছোট্ট হাড়কাটার করাত আর ভোঁতা স্কালপেল দিয়ে এক চমকপ্রদ অপারেশন চালালেন গাছটার ট্রাংক-এর ওপরের দিককার স্ফীত অংশে। দু'ঘণ্টা আটাশ মিনিট পর প্রফেসরের উত্তেজিত গলার হাঁক শুনে আমার বুকের ভেতর একটা টেনিস-বল ড্রপ খেয়ে লাফিয়ে উঠলো। ডায়েরীটা গাছের গুঁড়িতে ফেলে রেখে লাফিয়ে তাঁর কাঁধের কাছে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। প্রফেসর বললেন, 'দেখুন, দেখুন সাকলায়েন—'

দেখলাম—নোনা বালুতে গাছের বাকল বিছিয়ে তার ওপর সযত্নে রাখা একটা টাটকা মনুষ্য-মস্তিষ্ক!

আমি শুনতে পাচ্ছি সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপার থেকে ভেসে আসছে প্রফেসরের বিষণ্ণ অনতিস্পষ্ট কণ্ঠস্বর—সাকলায়েন, এই গাছের ভেতরই দুশো বছর ধরে হেকিম জুবায়েরের সহকারীর মস্তিষ্ক বেঁচে ছিলো, তাকে খুন করলাম আমি!

ফ্যাকাসে সাদা মস্তিষ্কের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার গা বেয়ে একটা হিমস্রোত ওপর দিকে উঠে যায়, গা-টা শির্‌শির্‌ করে ওঠে। কপালে দেখা দেয় চিন্‌চিনে ঘাম। খুব দুর্বল গলায় প্রফেসরকে বলি, 'প্রফেসর, আমি খুব অসুস্থ বোধ করছি।'

৭ নভেম্বর, রাত। ডিকিবার্ড।

এখন ভেবে আশ্চর্য হই অই আঠারোই অক্টোবরের অমন অবাক-করা দুপুরে এতো কথা ডায়েরীতে লিখবার মতোন মানসিকতা কেমন করে পেয়েছিলাম!

একথা বলার আর দরকার নেই বোধহয় যে—বেশ কদিন আগেই আমরা রাকারী দ্বীপ ছেড়ে এসেছি। এব্যাপারে জলদস্যু-মার্কা পতাকাটা খুব কাজ দিয়েছে। দ্বীপ ছেড়ে আসি আমরা অই আবিষ্কারের ঠিক সাত দিন পর—পঁচিশে অক্টোবর। খুব কম সময়ের ভেতর এই উত্তেজনার ধকল কাটিয়ে ওঠা আমার পক্ষে একরকম অসম্ভব ছিলো। ডায়েরী লেখার কথা চিন্তাই করতে পারিনি এ ক'দিন।

আগামীকাল ভোরেই আমাকে ডিকিবার্ড ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। আর আমার মনে এ সন্দেহও দোল খাচ্ছে যে, হয়তো আর কোনদিন আমার ডায়েরী লেখা না-ও হয়ে উঠতে পারে, সে জন্যেই কলম নিয়ে বসতে হলো।

প্রফেসর মস্তিষ্কটার অস্বাভাবিক স্ফীতি লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'এই স্ফীতিটা খুবই স্বাভাবিক, মস্তিষ্কটার অ্যাডাপ্টেশান ক্ষমতা চমৎকার ধরনের ভালো। মেনিনজেস্‌টা দেখুন, স্যাকলায়েন, ডুরা-মেটার কোথায়, সমস্তটাই তো সেলুলোজ দিয়ে তৈরি!'

আমি বলেছিলাম, 'প্রফেসর, এটাও এক ধরনের অ্যাডাপ্টেশান?'

প্রফেসর মাথা হেলিয়ে বলেছিলেন, 'উঁহু, মনে হয় না। বরং মনে হচ্ছে এই সেলুলোজের মেনিনজেস্‌টা হেকিম জুবায়েরেরই কীর্তি!'

আমি দুর্বলভাবে মাথা নেড়েছিলাম, 'প্রফেসর, কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না!'

উনি কাতোক্ষণ কেমন এক রকমের দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে

আমাকে দেখলেন. তারপর একনাগাড়ে অনেকক্ষণ ফ্যাঁসফেঁসে গলায় অদ্ভুত সব কথা বলে গেলেন, কতোক আমার মাথায় ঢুকেছে, কতোক ঢোকেনি। প্রফেসরের সেই কথাগুলোই আমি একটু গুছিয়ে লিখে ফেলছি। এর মাঝে অনেক কঠিন কঠিন তত্ত্ব ছিলো, দাঁত ভাঙা শব্দ ছিলো, সেগুলো বাদ দিয়েছি।

ধীরে ধীরে বা হঠাৎ করেই যখন দেহের ভাইটাল এক্টিভিটি-গুলো থেমে যায় তখনই বলা হয় লোকটি ডেড, বা তার মৃত্যু হয়েছে। আসলে এই ডেথ বা মৃত্যু দু'ধরনের···সোমাটিক ডেথ এবং মলিক্যুলার ডেথ। শেষেরটাই হচ্ছে আসল মৃত্যু। এখানে দেহের ইনডিভিজুয়াল সেলগুলো, মানে, তার প্রোটোপ্লাজমের জৈবনিক কার্যাবলী থেমে যায়, আক্ষরিক অর্থেই দেহের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু 'সোমাটিক ডেথ'-এর বেলায় এর একটু ব্যতিক্রম,—এখানে দেহের ভাইটাল অরগান কাজ বন্ধ করে দেয় ঠিকই, কিন্তু এদের সেল-এর প্রোটোপ্লাজম আরো চার থেকে পাঁচ-ছ'মিনিট পর্যন্ত বেঁচে থাকে। এখন মনে করা যাক, কোন দুর্ঘটনায় একটি লোক মারা গেলো। স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায় লোকটির 'সোমাটিক ডেথ' হয়েছে, কিন্তু সেলগুলো তখনো জীবিত, মানে, 'মলিক্যুলার ডেথ' তখনো শুরু হয়নি। ঠিক এসময় যদি একজন দক্ষ নিউরোসার্জারীর চিকিৎসক তার ক্রেনিয়াম খুলে মস্তিষ্কটা ফার্স্ট সারভাইকেল সেগমেন্ট থেকে কেটে নিয়ে অন্য কোন দেহে ট্র্যান্সপ্লান্ট করে, তাহলে ব্রেনটা তার পূর্বের কার্যক্ষমতা ফিরে পেতেও পারে। খেয়াল করবেন, আমি বলছি পেতেও পারে, গ্যারান্টি দিচ্ছি না কিন্তু। কাজটাতে সবচেয়ে বড়ো বাধা হচ্ছে সময়। হেকিম জুবায়ের আসলে এই কাজটাই করেছিলেন। অবশ্যি তাঁর কৃতিত্বটা অন্য ব্যাপারে, হেকিম তার সহ-

কারীর ব্রেনটা অপর কোন মানুষ বা পশুতে ট্র্যান্সপ্লান্ট না করে করেছিলেন একটা বহুবর্ষী রেন-ট্রিতে। আপনি জানেন, সাকলায়েন, অরগান ট্র্যান্সপ্লান্টেশান রি-ট্র্যান্সপ্লান্টেশান আমার গবেষণার বিষয়। আসলে এব্যাপারগুলো খুবই দুরূহ, আর ব্রেন-ট্র্যান্সপ্লান্টেশান তো এই কিছুদিন আগেও আমার কাছে ছিলো অসম্ভব, যদিও এর বহু আগে নার্ভ-সেল ট্র্যান্সপ্লান্ট করা আয়ত্তে এনে ফেলেছি। যাক, যা বলছিলাম, ট্র্যান্সপ্লান্টেশানে এক্সপেরিমেন্টাল সাবজেক্ট-এর আসল ব্রেন সরিয়ে নিয়ে তার জায়গায় লাগাতে হয় অন্য কারো ব্রেন, স্বাভাবিকভাবেই স্বল্প সময়ের ট্র্যান্সপ্লান্টেশানে ডিজেনারেশান শুরু হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি, রক্ত সংবহনে দেখা দেয় চরম জটিলতা। বুঝতে পারছেন মোটেই ইন্টারেস্টিং এক্সপেরিমেন্ট নয় এটা। বিরক্তির এক শেষ। এসব এক্সপেরিমেন্টে আবার জেনেটিক্স-এর বাধাও এসে যায়। হেকিম জুবায়ের খুব সম্ভব এসব বাধা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন, টিস্যু রি-জেনারেশানের নতুন কোন সহজ প্রক্রিয়াও তিনি উদ্ভাবন করতে পেরেছিলেন সেই দুই আড়াইশো বছর আগে।

এনিম্যাল এবং প্ল্যান্ট-কিংডমের মাঝে একটা প্রধান পার্থক্য হচ্ছে এই যে, প্রাণী অক্সিজেন গ্রহণ করে থাকে আর উদ্ভিদ কার্বনডাই-অক্সাইড। অবশ্যি দিন-রাত্রির একটা বিশেষ সময়ে উদ্ভিদও কার্বন-ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে, অক্সিজেন নেয়। এখন প্রাণীজগতের কারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি উদ্ভিদের মাঝে ট্র্যান্সপ্লান্ট করা হয়, তাহলে একটা উম্‌ভুম্বুলে ব্যাপার খুবই স্বাভাবিক। কারণটা হচ্ছে উদ্ভিদের কার্বনডাইঅক্সাইড কনজাম্প্‌শান। সত্যি কথা বলতে কি সাকলায়েন, ব্যাপারটা আমার বুদ্ধিতেও কুলোচ্ছে না। তবে একটা ক্ষীণ অনুমান এরকম—খুব সম্ভব হেকিম জুবায়ের বেশ কিছুদিন ধরে মস্তিষ্ক-

টাকে তাঁর ল্যাবরেটরিতে বিশেষ ধরনের কোন এক পুষ্টি দ্রবণে ডুবিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, আর ওই পুষ্টি দ্রবণের কম্পোজিশনটা গাছের শিকড় মাটি থেকে যে খাদ্যরস নেয় তারই কাছাকাছি ছিলো। সেলুলোজের মেনিনজেসটা হেকিম জুবায়েরের আবিষ্কার। এটা মস্তিষ্কের টিস্যু-অ্যাডাপ্টেশান ক্ষমতা শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিলো। একটা স্বাভাবিক ব্যাপার লক্ষ্য করুন, সাকলায়েন, মস্তিষ্কটা কেমন ফ্যাকাসে সাদা আর এর শিরা ধমনী দিয়ে মোটেই রক্ত সারকুলেট হচ্ছে না; আসলে এগুলো দিয়ে গাছের পুষ্টি দ্রবণই প্রবাহিত হতো। জলীয় পুষ্টি দ্রবণে কোন হিমোগ্লোবিন নেই, সেজন্যে অমন ফ্যাকাসে সাদা দেখাচ্ছে মস্তিষ্কটা। এখানে হিমোগ্লোবিনের দরকারই বা কী, অক্সিজেন বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ওটা দরকার, এখানে কনজিউম হচ্ছে কার্বনডাইঅক্সাইড, যদিও কার্বনডাইঅক্সাইড-এর একটা পার্সেন্টেজ থেকে যায় এর মাঝে। যাই হোক, মনে হয় কোন একটা ভালো দিনে এ-দ্বীপে এসে ওঠেন হেকিম জুবায়ের, আর ওই ভাঙা দালানেই আস্তানা গাড়েন। দালানটা তৈরি করিয়েছিলেন খুব সম্ভব তিনিই। তারপর একদিন শিশু রেন-ট্রিতে অস্ত্রোপচার করে পুষ্টি দ্রবণে ডুবিয়ে রাখা প্রিয় সহকারীর মস্তিষ্কটা স্থাপন করেন তার ধড়ে।

জুবায়েরের সহকারী বেঁচে রইলেন একটা গাছের ভেতর দু'শো বছর ধরে। সম্ভবতঃ মস্তিষ্কটা একটা নার্ভাস-সিস্টেম গড়ে তুলেছিলো গাছটাতে। এবং আমার বিশ্বাস, গাছের পুষ্টি দ্রবণই এই নার্ভাস সিস্টেমের কাজ করছিলো। সারা গাছকে রেগুলেট করছিলো এই তরল স্নায়ুতন্ত্র। মস্তিষ্কটার চমকপ্রদ কীর্তি হচ্ছে গাছকে দিয়ে গান গাওয়ানো। আপনি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন, সাকলায়েন

গাছটা গানও গাইতে পারতো। তার মানে, মস্তিষ্কটা হার্ডস্কেলকে কাজে লাগাতেও পারতো। হেকিম জুবায়েরের সহকারী একজন বিশারদও বটে। তরল স্নায়ুতন্ত্র গাছের পাতাকে নির্দিষ্ট একটা ফ্রিকোয়েন্সিতে কাঁপাতো; এতে করে হিউম্যান ল্যারিংস যেমন শব্দের ওয়েভ-লেংথ সৃষ্টি করে সেরকমই কিছু একটা হতো, আর তখনই গাছটা গান গেয়ে উঠতো, কথা বলে উঠতো।

অথবা, অন্যদিকে চিন্তা করুন, সাকলায়েন,—হিউম্যান ল্যারিংস-এর ক্যাভিটির ওপরের দিকে মিউকাস মেমব্রেন-এর একজোড়া ফোল্ডিং আছে, একে ভেস্টিবুলার ফোল্ড বলা হচ্ছে। নিচের দিকের ফোল্ডিংকে বলা হচ্ছে ভোক্যাল ফোল্ড। এই ভোক্যাল ফোল্ডই শব্দ তৈরির জন্যে দায়ী। রিমাগ্লটাইডিস হচ্ছে একটা ছোট্ট ফিশার যা সামনের দিকে ভোক্যাল-ফোল্ড-এর মধ্যেখানে এবং পেছনের দিকে এরিটিনয়েড কার্টিলেজের মধ্যেখান জুড়ে অবস্থিত। রিমাগ্লটাই-ডিসের ভোক্যাল-ফোল্ড-এর অংশকে বলা হচ্ছে 'ইন্টারমেমব্রেনাস পার্ট' এবং এরিটিনয়েড কার্টিলেজের অংশকে 'ইন্টারকার্টিলেজি-নাস পার্ট'। শব্দ-সৃষ্টির পূর্ব মুহূর্তে ভোক্যাল ফোল্ড এবং এরিটি-নয়েড কার্টিলেজের এডাকৃশান ও মিডিয়েল রোটেশান-এর ফলে রিমার মেমব্রেনাস ও কার্টিলেজিনাস পার্ট কাছাকাছি সরে আসে, এবং একটা লিনিয়ার চিংক্ বা লম্বালম্বি ছিদ্র তৈরি হয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ শব্দের সৃষ্টি। ফোল্ড-এর টেনশন যতো বেশি হবে, পিচ অব সাউণ্ডও ততো বেশি হবে,—সাকলায়েন, শব্দের উৎপত্তির ব্যাপারে বাতাসের ভূমিকার কথা ভুললে চলবে না কিন্তু। এখন মনে করুন, আপনার ওই তরল স্নায়ুতন্ত্র গাছের কতোকগুলো পাতাকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে একটা ল্যারিংস-এর মতোন ব্যাপার খাড়া

করে ফেললো—তু'চারটে পাতা দিয়ে এরিটিনয়েড কার্টিলেজের কাজ চালিয়ে দেয়া যায়, ভোক্যাল-ফোল্ডসও তদ্রূপ। চার-চার আট পাতার মাঝখানের অংশকে ধরুন রিমাগ্লটাইডিস, ট্র্যান্সভার্স স্পেসকে ভোক্যাল কর্ড,—চমৎকার স্বর-তন্ত্র, কী বলেন। একটা লম্বা শ্বাস ফেলেন প্রফেসর, তাঁর বিছের মতোন কালো ভুরুর নিচে শকুনে-চোখ তুটি জ্বলজ্বল করে ওঠে। একটু হেসে বলেন, খুব ধীরে ধীরে গাছটার অল্‌ফেক্টরী সেন্স আর অপ্‌টিক সেন্সও বোধহয় গড়ে উঠছিলো। সাকলায়েন, হেকিম জুবায়ের সত্যিকারের একজন জিনিয়াস ছিলেন!

প্রফেসর নূতন এক এক্সপেরিমেন্টে মেতে উঠেছেন। আমার জাভা যাওয়ার উদ্দেশ্য এই এক্সপেরিমেন্টের সম্ভাব্যতা যাচাই করা। মনে হচ্ছে, আরো কুড়ি-বাইশ বছর পর পৃথিবীতে এমন কিছু কিছু গাছ দেখা যাবে যারা মানুষের মতোই গান গাইবে, কথা বলবে। পৃথি-বীর মানুষ এই গাছগুলোর কী নাম দেবে আমি খুব সহজেই তা অনুমান করতে পারছি।

সাকলায়েনের ডায়েরী এখানেই শেষ।

টুকু চুপচাপ কতোক্ষণ দেবদারু বনের গান শোনে, তারপর ধীরে ধীরে ডায়েরী তুটো হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, যে গাছে হেলান দিয়ে বসেছিলো তার ধড়ে টোকা মেরে চমকে ওঠে।

একটা অশুভ ছায়া যেন টুকুকে তাড়া করে। টুকু দৌড়োয়।

বালক-রহস্য

[কুটি কবিরাজের বাংলো 'নির্জন'-এর আশেপাশে ছায়ার মতোন ঘুরে বেড়াচ্ছে বিশাল কাঁধঅলা এক বালক। কে এ?]

বাংলোর গেটের কাছে একটা বেঁটে ছায়া দেখতে পেলো কুটি কবিরাজ। প্রথমে ভাবলো ঝাকুলগাছদুটোরই একটা হবে হয়তো। তারপরই ভালো করে খেয়াল করে দেখলো, আসলে গাছ নয়—একটা মানুষ। সেই বালক নয় তো! অস্বস্তিতে ঘামতে লাগলো কুটি। একবার ভাবলো ডাকবে নাকি তুলুকে!

এক

রাতের বেলায় 'নির্জন'-এর পাহাড়ী ঢালের ঠিক ওপরটায় দুটো অদ্ভুত বেঁটে ঝাকুলগাছ গা ঘেঁষাঘেঁষি করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কুটির সন্দেহ—নিশুতি রাতে এই গাছদুটোই নির্জন-এর চারদিকটায় ঘুরেফিরে বেড়ায়।

কথাটা শুনে প্রথমে আমার এমন হাসি পেয়েছিলো, ওর নরোম পশমের মতোন কাঁচাপাকা চুলঅলা বড়োসড়ো মাথাটায় একটা চাঁটি মেরে বলেছিলাম, 'এরপর হয়তো বলবে কুটি, তুমি একজন

মৃত মানুষ, শুধুই দয়া করে পৃথিবীর ওপর একটু হেসেখেলে বেড়া-চ্ছো!' কুটি আমার কথা শুনে অদ্ভুত একরকমের দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসে হাসি হেসেছিলো। আমার গা শিরশির করে উঠেছিলো। এর তিনদিন পরই বললো ও, 'আমি ঠিক করেছি তুলু, আজ রাতের বেলা গাছদুটোকে একটু পাহারা দেবো। দু'ফ্লাস্ক চা, পোড়া খাসির গোশত আর নুন-পেঁয়াজ দিয়ে রাতটা চালিয়ে নেয়া যাবে। তোমার যদি ইচ্ছা হয় তো আজ রাতের জন্যে আমার ভল্লুকের চামড়ার গ্রেট-কোটটা গায়ে দিতে পারো। তবে ওটার যে একটু বিকট গন্ধ আছে তা তোমার সহ্য হবে কিনা জানিনা।'

আমি বললাম, 'ভল্লুকের চামড়ার গ্রেট-কোটের দরকার নেই, কারণ আমি তোমার সাথে গাছ পাহারা দিতে যাচ্ছি না। বে-ধারা কাজ করতে করতে তোমার চিন্তাভাবনাগুলোও সব বে-ধারা হয়ে গেছে, কুটি, তোমাকে কোন সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখানো দরকার।'

কুটি কিছু না বলে তার গ্যাজা দাঁতটা বের করে বাচ্চাদের মতো একটু হাসলো।

ভেবে দেখলাম কুটির প্রস্তাবে রাজি হওয়া যায় না। যদি সত্যিই দেখা যায় নির্জন-এর নিশুতি আঁধারে ঝাপড়া বাটুলদুটো নড়ে উঠেছে, তারপর আস্তে আস্তে হেলেদুলে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, নির্ঘাত ফিট হয়ে পড়ে যাবো। কথাটা ভাবতেই ভয়ে রোম খাড়া হয়ে উঠলো। কুটিকে বিশ্বাস করা যায় না। হতভাগা বিচিত্র সব কাণ্ড ঘটানোয় মহা ওস্তাদ। মাসখানেক আগেও ও আব্বাস পাঠান বলে একটা লোকের হাতে খুন হয়ে যেতে বসে-ছিলো। কুটির সন্দেহ হয়েছিলো আব্বাস পাঠানের আদৌ কোন হৃৎ-

পিণ্ড নাই। ভুলিয়ে-ভালিয়ে লোকটাকে একটা ক্লিনিকে নিয়ে গেছি-লো। ভেবেছিলো খানকতোক বুকের এক্স-রে উঠিয়ে নেবে। ব্যাপার টের পেয়ে গিয়ে লোকটা হুলস্থুল কাণ্ড বাধায়—ক্লিনিকের যন্ত্রপাতি ভেঙে চুরে ছত্রখান করে। শেষে কুটির গলা টিপে ধরে তাকে আধমরা করে, ক্লিনিকের দরজা টপকে উধাও হয়ে যায়। পরে মুস্তফির পায়ের একখানা হাড় বিক্রি করে ক্লিনিকের ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করে কুটি।

যাহোক, সেদিন রাতে এবং আরো দু'রাত জারুলগাছদুটোকে পাহারা দিয়েছিলো ও। কুটির বাংলোয় থাকলে ভোরের দিকে ফজরের নামাজ সেরেই জাফলং-এর পাহাড়ী সড়কে একটু বেড়াতে বেরোই। এই তিনদিনই বেড়াতে বেরুনোর সময় দেখেছি সারা রাত পাহারা দিয়ে ভোরের দিকে ফ্যাতেড়ার মতোন ঘুমোচ্ছে কুটি কবি-রাজ। সকাল আটটায় যখন দু'জনে একসাথে নাস্তা করতে বস-তাম সে সময় কুটির চোখদুটো বিচিত্র এক আভায় জ্বলজ্বল করতে দেখেছি। ভয়ে আমি আর ওই গাছদুটোর প্রসঙ্গ তুলিনি।

রাতের খাবার শেষ করে এইমাত্র ডাইনিং টেবিল থেকে উঠে গেলো কুটি। খুব সম্ভব তোয়ালেটা হাতে নিয়েই বাংলোর চওড়া বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরে ফুরফুরে বাতাস বইছে। আমার খাওয়ার আর একটু বাকি, জগ থেকে প্লেটে দুধ ঢেলে দিচ্ছে ওয়াসেক, আর আমি কলার খোসা ছাড়াচ্ছি। হঠাৎ কুটির গলা ভেসে এলো, 'একটু এদিকে এসো তো, তুলু!'

কুটির গলায় কী একটা যেন ছিলো, আমি ঝপ করে খোসাসুদ্ধ কলাটাই প্লেটে ছেড়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

আলো-আঁধারির ভেতর বারান্দায় কাঠের রেলিং-এর ওপর কনুইয়ে ভর রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে কিছু একটা দেখছে ও। আমি ওর পিছনে গিয়ে দাঁড়াতেই হাত দিয়ে গেটের কাছটা ইশারা করে ফিসফিসিয়ে বললো, 'ওই, ওটা কী, দেখো তো, তুলু !'

আবছাভাবে দেখলাম গেটের কাছে ছায়া ছায়া বেঁটে কী একটা যেন দাঁড়িয়ে আছে। মনে হলো আমার দম ফুরিয়ে আসছে। চাপা ফিসফিসে গলায় বললাম, 'জারুলগাছ নাকি, কবিরাজ !'

কুটি রাগতঃস্বরে বললো, 'উল্লুক ! গাছ কোনদিন হাঁটে, হেই !'

'তবে ?'

'দেখছো না কেমন চওড়া কাঁধ !' উত্তেজনায় গলার স্বর একটু কেঁপে উঠলো কুটির। বললো, 'মানুষ ! বেঁটে বিশাল নর একটা। চলো, তুলু, ধরার চেষ্টা করি ব্যাটাকে।'

কুটির মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই ছায়াটা দুলে উঠলো, তারপরই দ্রুত হেঁটে পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। কুটি আর আমি পড়িমরি করে বাংলোর বাইরে এসে সেই বাঁকের দিকে ছুটলাম। কিন্তু হেরে যেতে হলো, দুই বুড়ো কতোই আর দৌড়োবো। আমাদের ঝাপসা চোখের সামনেই একটা জমাট ছায়া তীব্র গতিতে ছুটতে ছুটতে আরো ঝাপসার ভেতর হারিয়ে যেতে থাকলো। শেষে লোকটা যখন পুরোপুরিই অদৃশ্য হয়ে গেলো তখন আমরাও দৌড় থামিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ফেরাপথ ধরলাম। আমার বুক ধড়ফড় করছিলো, তোতলাতে তোতলাতে বললাম, 'তোমার পাল্লায় পড়ে, কুটি, আরো কতো বিচিত্র কাজই না করতে হবে, উফ্ !'

কুটি মুখ খুললো না, চুপচাপ হাঁটতে লাগলো।

বাংলোর খোলা গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেটটা আবার লাগিয়ে দিতে দিতে একটা কথা বললো কুটি। বললো, 'মাসখানেক আগের ইত্তেফাকে একটা খবর পড়েছো, তুলু, নেপালের কোন এক গুহায় সোয়াশ' বছর আগের দুটো মনুষ্য কঙ্কাল পাওয়া গেছে, সেই সাথে পুরনো ধাঁচের তিনটে বন্দুক, একটা পিস্তল আর একটা তলোয়ার? আহাম্মদ সা'দ বলে লাখনৌর একজন সংবাদপত্রের রিপোর্টার এর আবিষ্কর্তা। উনি দাবি করেছেন সিপাহী যুদ্ধের সিপাহ্সালার বখ্‌ত খাঁ আর তাঁর ইউরোপীয় সহযোদ্ধা ওয়েবা-রের কঙ্কাল এ দুটো। তাকে সাপোর্ট দিয়েছেন দিল্লী মিউজিয়া-মের কিউরেটর সোমেশ ভাটিয়া। এই খবরে সারা ভারত উপমহা-দেশে তুমুল ঝড় বয়ে গেছে। পড়েছো, তুমি?' এবার থামলো সে। ওর চোখ দুটো চক্‌চক্ করছে।

আমি কোন উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে ভাবতে লাগলাম—কুটি এখন এ গল্প আমাকে শোনাচ্ছে কেন।

বাংলোয় ঢুকেই সোজা খাবারের ঘর। রাতে দুধ-কলা দিয়ে চারটে ভাত না খেলে আমার ভালো ঘুমই হয় না। নতুন প্লেট সাজিয়ে ছ'টা চাঁপাকলা নিয়ে বসলাম।

দুই

টং মেজাজে হাঁটছে কুটি।

সাড়ে আট কী ন'টার দিকে আমরা দোআঙ-শিকারে বেরিয়ে-

ছিলাম। এখন দুপুর। মাথার ওপর ঝকঝকে নীল আকাশ। একটু দূরে খাসিয়া পাহাড়ের নীলচে-সবুজ গা সোনালি রোদ্দুরের সবটুকুই শুষে নিয়ে কেমন ঝাপসা মেরে দাঁড়িয়ে আছে। শিকারে তেমন যুত হয়নি, মাত্র দুটি থুই আর একটি নীল-টিয়ে দোআঙ-এ আটকা পড়েছে। কুটির মেজাজ এমনিতে খিঁচড়োয়নি। দোআঙ-শিকারে তেজি উই পোকার দরকার, কিন্তু আমাদের চার জিয়ানি উই-এর সবগুলোই কেমন জ্যাল্‌জ্যালা। একটাও তেমন পাখনা ফড়কায়নি।

এখন আমরা জাফলং বাজারের দিকে হাঁটছি। কুটি হঠাৎ বললো, 'দোআঙ কাঠির আঠাগুলো ঠিকমতো তৈরি হয়নি তুলু, তিনটে টিয়ে উলু খেয়ে উড়ে গেলো, এমন বাজে আঠা!' কী ভেবে বললো, 'ওয়াসেক আসলে কোন কাজের নয়। আজ যদি আরমান থাকতো!' দীর্ঘশ্বাস ফেললো ও।

কুটি তার বিখ্যাত হলুদ রঙের জোব্বাটা পরেছে। হাতে গামহারের ডালের ত্যাড়াবেঁকা ছড়ি, কাঁধে ঝুলছে বাঁশের খাঁচা আর ক্যানভাসের ঝুলি। ঝুলির ভেতর একটা ড্যাগার আর ছোট্ট খুন্তি নিয়েছে। খুন্তি দিয়ে কী করবে আল্লা জানেন!

কুটিকে দেখাচ্ছে ঠিক চোলাইমুণ্ডার সেই খুনীটার মতোন। হো হো করে হেসে ফেললাম। হাসতে হাসতেই বললাম, 'কুটি, তোমাকে চোলাইমুণ্ডার সেই খুনী যাদুকরটার মতোন দেখাচ্ছে, বিশ্বাস করো!'

কুটি মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে খেঁকিয়ে উঠলো, 'ইয়ার্কি মারছো?' ক্ষণিকের জন্যে ম্লান হলো ওর মুখাবয়ব। শেষে কী ভেবে সাদা দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে বারকতোক হাসলো. 'তোমাকে তো দেখাচ্ছে ঠিক যেন গ্রহান্তরের আগন্তুক!'

ঘটনাটা এই—শিকারের ড্রেস হিসেবে আমি পরেছি একটা খাকি প্যাণ্ট আর নীল জীনস শার্ট, তার ওপর গাঢ় ধূসর রঙের ভারী খাটো ঝুলের একটা গ্রেট-কোট। মাথায় নেপালীদের টুপি, চোখে সানগ্লাস। প্যাণ্টের এক পায়ের ঝুল খানিকটা টেনে তুলে হাঁটুর কাছাকাছি একটুখানি চুলকিয়েছিলাম, সেটা আর নামানো হয়নি। পিঠে ঝুলছে বড়োসড়ো দুটো মাটির হাঁড়ি, হাতে লম্বা একটা ডাং।

নিজের অবস্থাটা চিন্তা করে একটু চুপসে গেলাম। মিনমিন করে বললাম, 'আমরা একদম আদিম হয়ে উঠেছি, কুটি। দুই বুড়ো যে-সব কাণ্ড করে বেড়াচ্ছি এতে যে-কোন লোকই আমাদের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করবে।'

কুটি অন্যমনস্কভাবে মাথা হেলালো, 'করলেও চারা নাই।'

'সেই।'

বাজারে ঢুকে মনে হলো চা খাওয়া দরকার। শিল-পাথরের দোকানগুলো পেরোলেই 'ওয়াজীর আলী টি স্টল'। স্টলের লাগোয়া জাফলং বাসস্ট্যাণ্ড-এর দপ্তর। এর উত্তরেই ছাড়া ছাড়া ভাবে দশ-বারোটা দোকান-কোঠার মাথার ওপর দিয়ে বিশাল এক স্যালাম্যাণ্ডারের মতোন খাসিয়া পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। কুটি আর আমি 'ওয়াজীর আলী'তেই ঢুকলাম।

ফিকে-চা আর নানকাতাই-এর অর্ডার দিলো কুটি। শুনেছিলাম এই স্টলের ফিকে-চায়ের একটা আলাদা সুনাম আছে। খাওয়ার পর বুঝলাম কথাটা মিছে নয়। কুটি আরো দু'কাপের অর্ডার দিয়ে বললো, 'ধারে-কাছের কোন হোটেলে দুপুরের খাওয়াটা সেরে নেবো নাকি, তুলু?'

'খেপেছো, এই লট-বহর নিয়ে এখানেই যে আমাদের ঢুকতে

দিয়েছে তাই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, দ্বিতীয় কোন দোকানে ঢোকার চেষ্টা করলে তাড়া করবে।'

কুটি বে-ধারা এক রকমের আত্মবিশ্বাসের হাসি হেসে বললো, 'তোমার ভায়ের জন্যে সকল দরজা খোলা। চলো, ওঠা যাক।'

বিলটা আমিই মিটিয়ে দিলাম। কুটির পকেটের পয়সা সমান-ভাবে আমি খরচ করতে পারি, আবার আমার পকেটের পয়সাও তেমনি কুটি। সেজন্যে হোটেল-টোটেলে বিল মেটানোর বেলায় আমরা ঠেলাঠেলি করি না। যে যখন পারি মিটিয়ে দিই।

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়েই মুখোমুখি একটা পুরনো রেন-ট্রি, কুটি সেদিকটা ইশারায় দেখিয়ে আমার কাঁধের কাছটা খিমচে ধরে চাপা স্বরে বললো, 'তুলু, দেখেছো?'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'দেখাদেখি আবার কী!'

'ওই বালককে দেখো। খুব সম্ভব এ-ই কাল রাতের আততায়ী!'

গাছের গুঁড়ির কাছে সত্যি সত্যিই দশ-বারো বছরের একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ভাবলাম 'আততায়ী' বলা বোধহয় ঠিক হলো না। একটা বাচ্চা ছেলে,—একটু বিশাল বটে, এ আর কী অনিষ্ট করতে পারে। আমরা একটু একটু করে ওর প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছি—হঠাৎ তোড়ে দৌড় লাগালো ছেলেটা।

এক নজরেই ছেলেটাকে পুরোপুরি দেখা হয়ে গেছে আমার। পরনে একটা ঢোলা হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি। একটু লম্বাটে মায়াবী মুখের মাঝে টলটলে দুটি চোখ, কালো আর গভীর—শেওলা-ধরা প্রাচীন পুকুরের মতোন। খুদে খুদে দাঁত। বেশ বলিষ্ঠ গড়নের গাট্টাগোট্টা বালক—খুমকুমা। বিশ্বাস করতে আমার মন ঠিক সায় দিচ্ছে না এই বালকই খুন-খারাবী জানা দুর্ধর্ষ এক আততায়ী।

কুটি আমাকে তার স্বপক্ষে বোঝানোর চেষ্টা করলো এই বলে যে, অমন চওড়া কাঁধঅলা বালক তার জীবনে আর দুটি দেখেনি, যেন এক কলির হারকিউলিস !

'শুধু কাঁধই নয়, কুটি,' আমি বললাম, 'তুমি বোধহয় খেয়াল করোনি বালকের পায়ের পাতা দুটোও অস্বাভাবিক চওড়া। তবু বলবো, ও নিতান্ত এক শিশু, আততায়ী বলা উচিত নয়।'

কুটি একটু হেসে বললো, 'কথাটা সত্যি, আমি আসলে এই অর্থে ওটা বলিনি, এখানে অন্য একটা মাহাত্ম্যের ঘোর আছে। তোমার কল্পনা এখানে খাপ খাবে না, তুলু। আর তুমি তো জানোই, কথার মীনিং বুঝে কথা চালাচালি আমার ধাতে নেই। নয় কী ?'

আমাকে মাথা নাড়তে হলো। সে আবার বলতে শুরু করলো, 'খাঁচা-টাচা এখানে রেখে চলো ওই ওর একটু খোঁজখবর নিয়ে আসি। হতভাগার জীবনীশক্তি সাঙ্ঘাতিক।'

দোআঙ-শিকারে বেরিয়ে অন্তত আট-দশমাইল হাঁটতে হয়েছে, এখন আবার চলেছে কোথাকার কোন এক উটকোর সুলুক-সন্ধান নিতে। কাঁদো কাঁদো হয়ে বললাম, 'মাফ চাই, কবিরাজ, এবার বাড়ি চলো, খিদেয় জান বেরিয়ে যাচ্ছে।'

ও চ্চুঃ চ্চুঃ করে মুখে এক রকমের শব্দ করে বললো, 'আগে বলোনি কেন ? ওয়াজীরের চায়ের স্টলে ? এক ডজন নানকাতাই খাওয়াতাম তোমাকে। আমার সাথে ভিড়েছো যখন একটু কষ্ট তো করতেই হবে। চলো, খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো।'

বাজারে বিস্তর ঘোরাঘুরি করে বালকের ব্যাপারে শুধু এটুকুই জানা গেলো—দিন আষ্টেক আগে জৈন্তা-জাফলং লাইনের বাসে

করে এখানে এসে নামে ও। একা। সাথে কেউ ছিলো না। দেশ-বাড়ি কোথায় কারো জানা নেই। রুটি-গুড় আর ছাতু খায়। ব্যাস্!

বাংলোয় ফেরার পথে কুটি হঠাৎ বললো, 'আচ্ছা, তুলু, একটা শব্দের মানে বলো তো—এম্বা খেং!'

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। উমভুম্বুলে চোখে কুটির মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এম্বা খেং!' আমার মনে হলো কুটি যেন একটা ঘোরের ভেতর আছে। ও মাথা হেলিয়ে এবার অন্য একটা কথা বললো। শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগলো। ফ্যাকাসে হেসে বললাম, 'আবোল-তাবোল বকার একটা লিমিট থাকা উচিত, কবিরাজ!'

'আবোল-তাবোলের আবার লিমিট!' কুটি হাসলো, 'তোমাকে বলা হয়নি, তুলু, এই বালকের জন্যে অনেকদিন থেকে অপেক্ষা করছি আমি। ওর সাথে দেখা হওয়ার আগেই যদি আমার এন্তেকাল হতো, তো খুব বড়ো একটা ক্ষতি হয়ে যেতো ছেলেটার।' হৃদয়ে মৃত্যু-চিন্তা উদয় হতেই মুখটা ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গেল কুটির। ক্ষীণ একটু হাসলো সে।

তিন

ঠুক্, ঠুক্, ঠুক্!

কাঠের দরজার গায়ে কেউ ভয়ে ভয়ে টোকা মারছে। এখন রাত দেড়টা। খাওয়া-দাওয়া সেরে ন'টার দিকেই শুয়ে পড়েছিলাম।

কুটি বলেছিলো বিছানায় যেতে তার একটু দেরি হবে, অন্তত একটার আগে নয়। ল্যাবরেটরিতে কিছুক্ষণ কাটাবে ও, খুব জরুরী একটা ব্যাপার নিয়ে তখন মগজ খেলাচ্ছিলো কুটি।

বিছানার ওপর উঠে বসে মনোযোগ দিয়ে শব্দটা শুনলাম। কুটি নয়, পাশের ঘরে কুটির নাক ডাকার ঘড়ঘড় আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। ওয়াসেক কি? উঁহু, ওয়াসেক হলে ডাক দিতো 'কবিরাজ চাচা' বলে। কোন আগন্তুক! বিছানা থেকে নেমে পা টিপে টিপে কুটির ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তাকে একটা মৃদু ঠেলা দিয়ে বললাম, 'কুটি, ওঠো। বাইরে কে যেন দরজায় টোকা দিচ্ছে।'

কুটি যেন জেগেই ছিলো, নাকের ঘড়ঘড়ানিটা থামিয়ে লাফ মেরে উঠে ঘরে আর বারান্দার সবগুলো বাতি জ্বালিয়ে দিলো। তার-পর বললো, 'কোন্ দরজায়?'

বিরতিসহ তখনো ঠুক্‌ঠুক্ শব্দ ভেসে আসছিলো। কুটি উত্তে-জিত পায়ে হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে দিলো।

ফ্লোরেসেন্ট লাইটের নরোম আলোয় দরজার বাইরে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে চওড়া কাঁধের বালক! আমার কেমন শীত শীত করতে লাগলো। কবিরাজের ধারণা তাহলে সত্যি?

কুটি অদ্ভুত এক স্বরে ছেলেটাকে ভেতরে আহ্বান জানালো,—'এসো—ইয়ে, মানে, আসুন, ভেতরে আসুন। অনেকদিন থেকেই আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।'

খুদে দাঁত বের করে ভয়েভয়ে হাসলো বালক। বড়ো সোফাটায় বসতে বসতে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললো, 'আপনিই কুটি কবি-রাজ?'

কুটি কবিরাজ হাত কচলাতে কচলাতে বললো, 'জ্বি, আমিই।

আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো আপনার নাম গফুর খান। ঠিক নয় কি?'

বালক কতোক্ষণ চুপ থেকে লম্বা করে শ্বাস ফেলে বললো, 'বুঝেছি, মীর্জা আসফ আলী সব কিছু লিখে রেখে গেছেন। পুরো ঘটনা তাহলে আপনার জানা আছে?'

কুটি হাসলো, 'কিছুটা।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুলু, আমার অনুমানই সত্যি; তোমাকে জানিয়ে দিই, এই বালকের বয়েস কম করে হলেও সোয়াশ' বছর!'

আমার সারা গা শিরশির করে উঠলো। অবাস্তব এক অনুভূতিতে অনেকক্ষণ থেকেই একটু একটু করে কাঁপছিলাম। হঠাৎ মাথাটা দুলে উঠলো। দুর্বল গলায় কুটিকে বললাম, 'কুটি, আমি খুব অসুস্থ বোধ করছি—'

লোকটা ক্লান্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে কুটিকে বললো, 'ইনি কে?'

এই রহস্যময় বালককে এবার আমি 'লোক' বললাম এ কারণে যে, এতোক্ষণে আমি তার সারা অবয়বে অতিপ্রাকৃত এক প্রাচীনত্বের ছায়া দেখতে পাচ্ছি। মায়াবী বালক-বালক মুখে, ঝুলে-পড়া চুলে, ক্লান্ত চোখের পাতায়, বিশাল চওড়া কাঁধে, আজানুলম্ব হাতদুটিতে, চওড়া পায়ের পাতায়—সবখানে আমি সেই অসম্ভব প্রাচীন ছায়াকে দেখতে পাচ্ছি। আমার যেন ঘুম আসছে। কোন গভীরে তলিয়ে যেতে যেতে শুনলাম কুটি বালককে বলছে, 'মীর্জা আসফ আলী দ্বিতীয় ওষুধটা বানাতে ব্যর্থ হন একটামাত্র অনুপানের অভাবে, কিন্তু আমি ব্যর্থ হই নাই, খান সাহেব। এম্বা থেং-এর রহস্য আমি উদঘাটন করেছি, ওটা আসলে একটা শিকড়, সত্য-

শল্লকীর শিকড়, অরুণাকোটের বনে এ শিকড় পাওয়া যায়…'

চার

সকালে খাবার টেবিলে বসে নাস্তা করতে করতে আমরা গল্প করছিলাম। দু'একটা ব্যাপারে বালক গফুর খানের সাথে আমাদের সমঝোতা হয়েছে। যেমন – একটু আগে কুটি বালককে বলেছিলো, 'আমাদের "তুমি"ই বলবেন, "আপনি-আপনি" বলে আর লজ্জা দেবেন না। হাজার হোক, আপনি আমার দাদা গোলাম আলীর বাল্যবন্ধু।' কুটি একটু হে হে করে হেসেওছিলো। গফুর খান কুটির কথা মেনে নিয়েছে। এখন সে আমাকে আর কুটিকে নাম ধরেই সম্বোধন করছে। ওয়াসেক কিছু বুঝতে না পেরে একটা আচ্ছন্নতার ভেতর কাজ করে যাচ্ছে। ভোরে ঘুম থেকে উঠেই তাকে চাপাতি আর গোশত ভুনা বানাতে হয়েছে। বালকের খাওয়ার তাকত মাশাল্লা। দশটা চাপাতি আর দুই বাটি গোশত একাই তুলে দিয়েছে। মুখে বলেছে, অনেকদিন এরকম খানা হয়নি।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে কুটি বললো, 'কাল রাতে বড় চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে, তুলু। তোমার স্নায়ুতন্ত্র এতো দুর্বল!'

আমি বললাম, 'দুর, ও কিছু না। ব্যাপারটা আমি ঠিক সহজভাবে নিতে পারছিলাম না। আসলে কারোপক্ষেই এটা সহজভাবে নেয়া সম্ভব নয়।'

বালক দেশলাই-এর কাঠি দিয়ে একটা পাসিংশো ধরিয়ে একমুখ

ধোঁয়া ছেড়ে বললো, 'ঠিক বলেছো, তুলু, আমার ব্যাপারটা অনেকেই মনে করেছে ভৌতিক। কুটির কাছে আসার সাহস পাচ্ছিলাম না ওই জন্যেই। বখ্‌ত খাঁ আর ওয়েবার মারা গেলে তাঁদের ওই গুহায় ফেলে রেখে কাঠমণ্ডুতে চলে এসেছিলাম। চোদ্দ বছর এক "সোনারে"র গদিতে কাজ করেছিলাম। চোদ্দবছর পর এক রাতে মালিক একটা জ্বলন্ত মশাল নিয়ে আমাকে তাড়া করলো। তার গালি-গালাজ থেকে বুঝলাম লোকটা ভয় পেয়েছে। বলছে, "হারামজাদা ডাইন, চোদ্দ বছরেও তোর উমর বাড়লো না, এ কেমন কথা!" ওরা ষড় করেছিলো আমাকে পুড়িয়ে মারবে, তাই জান নিয়ে কাঠমণ্ডু থেকে পালিয়ে গোরক্ষপুর চলে এলাম। সেখান থেকে বেনারস। দিন কতোক ওখানে কাটিয়ে আবার একদিন বেরিলীতে গিয়ে হাজির হলাম। ভূত-ভূত হয়ে চাচা হেকিম আসফ আলীকে খুঁজতে লাগলাম। ততোদিনে আমি বুঝতে পেরেছি জীবনভর এরকম বালক হয়ে থাকার মাঝে কোন আনন্দ নাই, বৈচিত্র্য নাই,—আছে জানের খতরা আর একাকিত্বের দুঃখ। চাচা আসফ আলীকে খুঁজে পেলে বলতাম, আমাকে আমার আগের গফুর খান বানিয়ে দিন, আমি সারাজীবন বালক থাকতে চাই না। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজির পর শুধু এটুকু জানতে পারলাম, গোলাম আলী আর চাচীকে নিয়ে যুদ্ধের শুরুতেই তিনি বাঙ্গালমুলুকে চলে গেছেন।' বালক হঠাৎ চুপ করে গেলো।

আমি বললাম, 'তারপর?'

ও ম্লান হাসলো, 'তারপর একশ' বছর কেটে গেছে, কতো যুদ্ধে স্বদেশীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছি, আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে তামাম বাঙ্গালমুলুক, আসাম,

নেপাল-ভুটান, সিকিম আর চীনের দক্ষিণাংশে আসফ চাচাকে ঢুঁড়ে বেড়িয়েছি। অবশ্যি ষাট বছরের মাথায় একবার গোলাম আলীর খোঁজ পেয়েছিলাম। তখন ও বর্মামুল্লুকের মান্দালয়ে। খুব কষ্ট করে ওখানে হাজির হয়ে শুনলাম হেকিম গোলাম আলী গত হয়েছে, আর তার পুত্র নূরন্নবী আসামে পাড়ি জমিয়েছে। মন খারাপ হয়ে গেলো।'—গফুর খান চুপ করে গিয়ে খোলা জানালা দিয়ে দূরে খাসিয়া পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইলো।

কুটি ওয়াসেক মিয়াকে বললো, 'আরেক কেটলি চা নিয়ে আয়, বাবা, আর খান কতোক মিঠা আলু।'

পাঠকের কৌতূহল মেটানোর জন্যে দু'একটা কথা বলে নেয়া এখন উচিত মনে করি।

ভাগ্যান্বেষণে হেকিম মীর্জা আসফ আলী (কুটির দাদার বাবা) বাংলা থেকে রোহিলাখণ্ডে পাড়ি জমিয়েছিলেন। অল্প দিনের ভেতর হেকিম হিসেবে বেরিলীতে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। খান বাহাদুর খানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন তিনি। গফুর খান ছিলো এই খান বাহাদুর খানেরই বালক-ভৃত্য। যখন খুব ছোট তখন এই গফুর খান কুটির দাদা গোলাম আলীর খেলার সাথী ছিলো।

আসফ আলী তার হেকিমী বিদ্যা দিয়ে খুব আশ্চর্য এক দাওয়াই আবিষ্কার করেন। এই ওষুধ সেবনে বয়স বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়, রোগ জ্বরা কাছে ঘেঁষে না; আর স্বাভাবিক আয়ুর চেয়ে অন্ততঃ তিন-চারগুণ বেশি হয় আয়ু। পঁচিশ বছর আগে একটা বেড়াল ছানা আর দশ-বারোটা পূর্ণবয়স্ক বেড়ালের ওপর তিনি প্রথম ওষুধটা প্রয়োগ করেন। দেখা গেলো ওষুধ প্রয়োগের সাত দিনের ভেতরই

পূর্ণবয়স্ক সবগুলো বেড়াল মারা গেলো, কিন্তু ছানাটা দিব্যি বেঁচে আছে। সিপাহী যুদ্ধ শুরু হওয়ার বছরখানেক আগে এই ছানার পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়, এতোগুলো বছরের ভেতর একবারও অসুখে পড়েনি ওটা। কথাস্থলে একদিন খান বাহাদুর খানকে ওষুধটার কথা বলে ফেলেছিলেন তিনি।

খান বাহাদুর আফসোস্ করে বলেছিলেন, তার কোন ছেলে নেই, থাকলে ছেলেদের এই ওষুধ সেবন করার্তেন। শেষে কী ভেবে আসফ আলীকে বললেন, তার বালক-ভৃত্য গফুর খানের ওপর ওষুধটা প্রয়োগ করা যেতে পারে কি? আসফ আলী আঁতকে উঠে বলেছিলেন, এটা গুনাহ্র কাজ, সারা জীবন কাউকে বালক হিসেবে জিন্দেগী কাবার করানোর চিন্তা করাটাই ঘোর অন্যায়।

কিন্তু খান বাহাদুর খান ছিলেন নাছোড়বান্দা। আর শেষে গফুর খান নিজেও দেওয়ানের কাছে বিষয়টা অবগত হয়ে দারুণ আগ্রহী হয়ে ওঠে। বিশেষ করে গফুর খানের নিজেরই সনির্বন্ধ অনুরোধে একমাত্রা ওষুধ তাকে খাইয়ে দেন আসফ আলী। ওষুধটা খাওয়ানোর পরই বলেছিলেন, আমি বড়ো একটা গুনাহ্র কাজ করলাম। তিনি এ-ও বলেছিলেন, আজ থেকে আমাকে এই দাওয়াই-এর গুণ নষ্ট-কারী অন্য দাওয়াইটাও তৈরি করতে লেগে যেতে হবে। পরের বছর মে মাসে বেরিলীতে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। খান বাহাদুর খান রোহিলাখণ্ডের অবিসংবাদী নেতা মনোনীত হয়ে সরকারের পরি-চালনা হাতে তুলে নেন। এদিকে গফুর খাঁ বখ্‌ত খাঁ-র আর্দালী হয়ে বেরিলী ত্যাগ করে দিল্লী রওনা হয়ে যায়, আর হেকিম মীর্জা আসফ আলী বাঙ্গালমুলুকে পাড়ি জমান।

*

গফুর খানের কথার উত্তরে ধূর্ত হেসে কুটি বললো, 'প্রথম দিন দেখে একটু খটকা লেগেছিলো ঠিকই, কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই বুঝে ফেলেছিলাম যে এই বালকই হচ্ছেন গফুর খান। হেকিম মীর্জা আসফ আলী তাঁর রোজ-নামচায় আপনার চেহারার পুরো বর্ণনা দিয়ে গেছিলেন। খটকা বাধিয়েছিলো ওই চওড়া কাঁধ আর পায়ের পাতা। চওড়া কাঁধের কথা আসফ আলী লেখেননি। যাহোক, একটু চিন্তা করতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেলো—সোয়াশ' বছর ধরে যে লোক বহাল তবিয়তে দুনিয়ায় আছে, স্বাভাবিকভাবেই আস্তে আস্তে তার পায়ের পাতা, আর দু'কাঁধ চওড়া হয়ে আসবেই। হাত দুটোও লম্বা হয়ে যাবে। ঘর্ষণে ঘর্ষণে দাঁতের পাটি ক্ষয়ে গিয়ে দাঁতগুলো খুদে খুদে হয়ে যাবে। আপনার বেলায় ঠিক তাই হয়েছে।'

'ওফ্, কুটি ! কী ওস্তাদী বুদ্ধি তোমার !' বললাম আমি।

বালক মৃদু হেসে বললো, 'হেকিম আসফ সাহেবের মগজ পেয়েছে কুটি। তিনিও ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান।'

এসময় কুটি একটা কথা বললো, 'আপনি বলছেন, জখমী হয়ে বখ্ত খাঁ নেপালের দিকে তরাই-এ পালিয়ে আসেন এবং সেখানেই একটা গুহায় মারা যান। কিন্তু গবেষকরা বলছেন নবাবগঞ্জের যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়। এব্যাপারে তারা অনেক প্রমাণাদিও উত্থাপন করেছেন।'

বালক বললো, 'এ তাদের ভুল। নবাবগঞ্জ থেকে তিনশ' পচানব্বই জন বিশ্বস্ত সেপাই নিয়ে অক্ষত দেহে বখ্ত খাঁ সিকারে এসে শাহজাদা ফিরোজের সাথে মিলিত হন। এখানে একজন সায়েব-সালার তাঁদের সাথে যোগ দেন। ইনি হচ্ছেন মার্টিন ওয়েবার।

বিচ্ছিন্ন কয়েকটা যুদ্ধ হয় এসব স্থানে। একে একে সেপাইরা মারা পড়তে থাকে। শাহজাদা ফিরোজশাহ দু'শো গাজী সেনাসহ তাঁর বাকি আড়াই হাজার সিপাহী নিয়ে আর একবার ইংরেজদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।'

বালক চুপ করে রইলো। কতোক্ষণ পর স্বগতোক্তির মতো বললো, 'সিপাহীযুদ্ধের সময় আমি অন্যান্য মোগল রাজপুত্রদেরও দেখেছি, কিন্তু শাহজাদা ফিরোজের মতো তেজস্বী আর ব্যক্তিত্বময় কেউই ছিলেন না। আমাদের পরাজয়ে প্রকৃত অর্থে বিশ্বাসঘাতকদের জয়ই সূচিত হয়। বিপ্লবের আগাগোড়া কলঙ্কিত হয়ে ছিলো কতকগুলো গাদ্দারের বিশ্বাসঘাতকতায়। সিকারের পর শেষ আশার বিন্দুও যখন শেষ হয়ে গেলো, ভগ্নমনোরথ হয়ে ফিরোজশাহ্ ইরানের দিকে চলে যাওয়া স্থির করেন। বখ্‌ত খাঁ আর ওয়েবারের ইচ্ছা ছিলো ফিরোজশাহ্‌কে নিয়ে শেষবারের মতো একটা চেষ্টা নেয়া। কিন্তু তাঁদের সৈন্য গোলাবারুদ বা রসদ-পত্র কিছুই ছিলো না। নেপালের সীমান্তে এসে বখ্‌ত খাঁ আমাদের সবাইকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে বলেন, "তাঁর সাথে থাকলে আমাদেরও বিপদ হবে, যে যেভাবে পারি যেন পালিয়ে জান বাঁচাই।" দু'তিনজন সেপাই, ওয়েবার আর আমি শেষ পর্যন্ত সিপাহ্‌সালারের সাথে ছিলাম। পথে দশবারোটা বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হয়, এতে বখ্‌ত খাঁ বাঁ কাঁধ আর বাহুতে মারাত্মক জখম হয়েছিলেন, প্রচুর রক্তপাত হচ্ছিলো; তাছাড়া আগে পিলেবিতে এক সংঘর্ষে ডান বুকের হাড়েও গুলি বিঁধেছিলো, সেটা তখনো সারেনি। বাষট্টি বছরের এই তেজী বৃদ্ধ তবু কাবু হয়ে পড়েননি। নেপাল সরকার খান বাহাদুর খানকে ইংরেজদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন সেটা আমাদের

কানে এসেছিলো, সিপাহ্সালার তাই আর রাজধানীতে না গিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেন। ওয়েবারও তাঁর সাথে ছিলেন। আমি আর আরেকজন রিসালদার—আজমল বেগ, এই দু'জন আশপাশের গাঁও থেকে তাঁদের খাবার যোগাতাম। ঈসায়ী উনষাটের ফেব্রুয়ারি মাসে বখ্ত খাঁ মারা যান। ওই দিন সন্ধ্যাবেলা পিস্তলের গুলি চালিয়ে ওয়েবারও আত্মহত্যা করেন। এই তো ব্যাপার !

'কুড়ি বছরের মাথায় অবশ্যি একবার আমি যে গুহায় বখ্ত খাঁ আর ওয়েবারের মৃতদেহ পড়েছিলো সেখানে গিয়েছিলাম। তাঁদের ব্যবহার করা অস্ত্রগুলো তেমনই রয়ে গেছে দেখতে পাই, হাড়-গোড়ও প্রায় সংরক্ষিত ছিলো।' বালক ম্লান হাসলো।

আমি বললাম, 'আপনি হয়তো জানেন না মাত্র কিছুদিন আগে লাখনৌর একজন সাংবাদিক এই কঙ্কাল দুটো, মানে, ঠিক কঙ্কাল অবশ্যি নয়, কিছু হাড়-গোড় আর বন্দুকগুলো আবিষ্কার করেছেন !'

গফুর খান মাথা নেড়ে একটুখানি হাসলো, 'আহম্মদ সা'দকে আমিই জানিয়েছিলাম, কিছু টাকার প্রয়োজন পড়েছিলো, তাই।' তারপর কী ভেবে বললো, 'ওই দিনগুলোর কথা ভুলে থাকতে চাই, কুটি, কিন্তু পারি না, সবকিছু ছবির মতো চোখের সামনে ভাসতে থাকে।—সেই খান বাহাদুর খান, ফিরোজশাহ্, বখ্ত খান, মৌলবী আহমদউল্লাহ সেই বেরিলী শাহজাহানপুর, পিলেবি—সেই নাঘিনা মুরাদাবাদ নজুফগড় ! আর দিল্লী, আহ্ !'

কুটি বললো, 'খান সাহেব, সিপাহীযুদ্ধের ওপর একটা বই লিখতে শুরু করে দেন না কেন। সিপাহীযুদ্ধও ঠিক না, মানে, জীবন চরিত্র, এই অটোবায়োগ্রাফী আর কী ! খুব বিকোবে।'

বালক হেসে বললো, 'পাগল !'

আমি দেখলাম কুটি কবিরাজের চোখ জ্বল্জ্বল্ করে জ্বলছে। বালক গফুর খানের রহস্য কি ফাঁস করে দেয়ার মতলব আঁটছে হতভাগা? কুটিকে বিশ্বাস নেই। একা পেলে তাকে একবার ঠেসে ধরতে হবে।

কুটি হঠাৎ বললো, 'তুলু, দেরি করা উচিত নয়, কালই অরুণাকোট রওনা হয়ে যেতে হবে।'

পাঁচ

অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড ঘটে গেছে আজ। এই কিছুক্ষণ আগে। কাঠ হয়ে একটা চেয়ারে বসে আছি আমি। বসে বসে দরদর করে ঘামছি। কুটি সারা ঘরময় অপ্রকৃতিস্থভাবে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে আর বিড়বিড় করে কী সব বলছে। একটু আগে ও 'ফেরার' হয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করছিলো। যখন ওয়াসেক মিয়া 'চাচা, আপনে পোলাটারে খুন কইরা ফালাইলেন, পুলিস আসিয়া ধরবো, আমি পালাইতেছি' বলেই একখানা লুঙ্গি আর একটা চটের ছালা নিয়ে বাংলোর পেছন দিক গলে খাসিয়া পাহাড়ের দিকে দৌড়োতে লাগলো; তখনই কুটি ঠিক করে ফেলেছিলো ভাগবে। কিন্তু কী ভেবে শেষে ঠিক করেছে যা থাকে কপালে জয়ন্তিয়া থানার পুলিসে সারেণ্ডার করবে। সেই থেকে ও পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। গফুর খানের বীভৎস ভৌতিক মৃতদেহটা স্থির অবিচল হয়ে বসে আছে চেয়ারে।

অরুণাকোট থেকে ফিরে এসে কাল সারা রাত ল্যাবরেটরিতে জেগে কাটিয়েছিলো কুটি। সকালের দিকে নাস্তা করতে করতে বলেছিলো, 'তুলু, রাতে ওষুধটা বানিয়ে ফেলেছি। এখন খানসাহেব যদি রাজি

থাকেন তো আজই ওটা তাঁকে খাওয়াবো।'

মোরগের রানে কামড় বসাতে বসাতে গফুর খান বলেছিলো, 'রাজি না হলে তোমাকে খুঁজে বের করার জন্যে অমন পাগল হয়ে উঠতাম কি? ওষুধটা খাওয়ার জন্যে আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি, কুটি।'

নাস্তা খাওয়া শেষ হতেই কুটি তার ল্যাবরেটরিতে চলে গিয়েছিলো। একটুক্ষণ পর হাতে করে একটা খল-নুড়ি নিয়ে খাবার ঘরে ফিরে এলো। খলের ভেতর ঘোর হলুদ রঙের থকথকে একটা পদার্থ।

খলটা ও বালকের হাতে দিয়ে বলেছিলো, 'বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলে খেয়ে নেন।'

তীক্ষ্ণ চোখে কুটি আর আমি বালককে নিরীক্ষণ করছিলাম। ওষুধ খাওয়ার পর বোধহয় পাঁচমিনিটও যায়নি, হঠাৎ অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম গফুর খান ঘামতে শুরু করেছে। কুটি বললো, 'ও কিছু না, পাঁচ-সাত হপ্তা এরকমই হবে, বমি বমি করবে। গা ব্যথা আর মাথা টন্‌ টন্‌ করা—এসব উপসর্গ দেখা দিতে পারে। হেকিম আসফ আলী সবকিছু গুছিয়ে লিখে গেছেন।'

গফুর খান পানি খেতে চাইলো। আমি চমকে উঠলাম, বালকের রিনরিনে কণ্ঠস্বরের বদলে কেমন মোটা পুরুষ-পুরুষ কণ্ঠস্বর যেন শুনলাম। ভয় পেয়ে কুটিকে ডাকলাক, 'কুটি!'

ওয়াসেক মিয়া গ্লাসে পানি ঢেলে গফুর খানকে দিলো। কুটি ততোক্ষণে বিন বিন করে ঘামতে শুরু করেছে। এতোক্ষণে আমি খেয়াল করলাম এক অদ্ভুত পরিবর্তন শুরু হয়েছে বালকের অবয়বে। ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গিয়ে দেখতে লাগলাম মাত্র নব্বই কি পঁচানব্বই সেকেণ্ডের ভেতর বালক গফুর খান পরিণত হলো বলিষ্ঠ গাট্টা-গোট্টা

এক পুরুষে ; মুখভর্তি কালো কুচকুচে দাড়ি-গোঁফ, বলিষ্ঠ শালপ্রাংশু বাহু, হাত-পা আর সারা গায়ে থাবা থাবা মাংস, উফ্ !

ওয়াসেক মিয়া 'ইয়াল্লাহ্' বলে দরজা খুলে দৌড় লাগালো।

কুটি কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকলো, 'খান সাহেব !' জোয়ান গফুর খান কেমন ফ্যাসফেঁসে গলায় বললো, 'মাথায় কিসে যেন পিন ফোটাচ্ছে কুটি, বড্ড কষ্ট হচ্ছে।'

কুটি মিনমিনে গলায় বললো, 'এরকম তো হওয়ার কথা ছিলো না। ঘাবড়াবেন না, খান সাহেব, দেখি—'

আর ঠিক তখনই আমি চিৎকার করে উঠেছি, 'কুটি, দেখো, দেখো !'

গফুর খানের চুল আর দাড়ি-গোঁফ সাদা হতে শুরু করেছে। শক্ত টান টান মাংসপেশী ঢিলে হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ও আমাদের দিকে।

কুটি কবিরাজ বিড়বিড় করে কি বললো, বোঝা গেল না। এবার গফুর খানের ভুরু-টুরুও সাদা হতে শুরু করেছে, গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে, মাথার চুল ঝরে গিয়ে বিশাল টাক্ দেখা দিয়েছে। ঝুলে-পড়া চোখের পাতায় ঘোলা-ঘোলা চোখদুটি প্রায় ঢেকে গেছে, শরীরে মাংস বলতে কিছু নেই। লোলচর্মের নিচে মোটা হাড় ক'খানা স্পষ্ট। পিঠের দিকে বিশাল এক কুব্জ দেখা দিয়েছে।

হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠে দু'হাত দিয়ে চোখ ঢাকলো কুটি।

আমি কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকলাম, 'খান সাহেব, খান সাহেব !'

সাড়া পাওয়া গেল না।

মৃত্যু হয়েছে অতি বৃদ্ধ প্রাচীন-বালক গফুর খানের।

শকুন

খুব নিস্তব্ধ, আর শেওলা-ধরা প্রাচীন এক পুকুরের মতো নিঃসঙ্গ একটা অনুভূতি ওর মগজের কোনখানে ঝাপ্টা মারে। নাক দিয়ে গভীরভাবে বাতাস টেনে বোঝার চেষ্টা করে অপরিচিত গন্ধটা কিসের। উঁহু, কিছু বোঝা গেলো না। বন্দুকটা দোকানের চুন-কাম করা কাঠের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ে ও। ঝকমকে চোখে বুড়ো দুটোর দিকে তাকায়। ফরাস-চৌকির ফর্সা বিছানার দু'প্রান্তে মুখোমুখি বসে আছে দুই বুড়ো। যথেষ্ট বয়েস হয়েছে দু'জনের।

'শ'য়ের ওপর,—সোয়াশ'ও হতে পারে।' ভাবলো ও।

ঢুলু ঢুলু চোখে সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে পান চিবিয়ে যাচ্ছে একজন। শনের মতো সাদা চুল আর সাদা ছাগল-দাড়ি ফ্যানের হু-হু বাতাসে ফুরফুর করে উড়ছে। পানের পিক থুতনি বেয়ে দাড়ির দিকে নেমে যাচ্ছে। একটা ভয়ঙ্কর খুনখারাবির লাল ছোপ ওর বুকের কাছে সাদা দাড়িতে আস্তে আস্তে বড়ো হয়ে উঠছে। দ্বিতীয় বুড়োর মাথায় একগাছিও চুল নেই। লোকটা কালো, চামড়া ঝুলে পড়েছে। পাতলা ঠোঁট। সাদা একজোড়া ঘন ভুরু। দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। ভোঁতা নাকের ওপর শিঙের ফ্রেমের চশমা। খট্‌খটে হাত দিয়ে ধুনুরির ধনুকের ক'গাছি ছিলা টেনে টেনে পরখ করছে বুড়ো। গন্ধটা উঠে আসছে ওই ছিলাগুলো থেকেই। আমজাদের গা-টা ঘিন ঘিন করে উঠলো। বেশ কিছুক্ষণ

বসে থাকার পর উসখুস করতে করতে বললো, 'আজ আর বোধহয় আসবেন না, না ? আমি না হয় আরেকদিন...'

ঠিক এসময় রিনরিনে মিষ্টি স্বরে কে বলে উঠলো, 'উঁহু', বইসেন, আজিমুল্লা চাচা আসতিছে, দশ মিনিটের মধ্যি আসি পড়বো !'

চমকে ওঠে আমজাদ, ভেতরের আধো-অন্ধকারটার দিকে তাকালো। ওখানে উবু হয়ে বসে আছে আরেক বুড়ো। সরু, আর ভীষণ ফর্সা ! উত্তেজনায় প্রায় উঠে দাঁড়িয়েছিলো ও, বসতে বসতে বিরক্ত গলায় বললো, 'উহ্, কি বেয়াড়া আক্কেল আপনার, এরকম হঠাৎ করে কথা বলার কোন মানে হয় !' তারপর একটু দম নিয়ে বললো, 'ওখানে বসে বসে কী করছেন ? কোনদিন দেখিনি তো এখানে।'

ছাগল-দাড়ির মুখখানা পঞ্চভুজাকৃতি, যখন হাসে মুখের দু'পাশে আরো দুটো কোণের উদ্ভব হয়, আর ঝক্‌ঝকে দু'পাটি দাঁত দেখা যায়। কথা বলার সময় বুড়ো সরাসরি মুখের দিকে তাকায় না, দেয়ালের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে থাকে। আমজাদের কথায় একটা মিহিন হাসি দিয়ে বললো, 'ইয়াসিন আমাদের কর্মচারী, গেলো হপ্তায় এখানে ওর চাকরি হয়েছে। বালিশ আর লেপের খোলে তুলা ভরার চাকরি।'

অন্ধকারের ভেতর থেকে ইয়াসিনের রিন রিনে গলার হাসি শোনা গেলো। অস্বস্তি লাগছে আমজাদের ; বললো, 'ইয়াসিন মিয়ার বয়েস কতো হবে, অমন বাচ্চাদের মতো গলার স্বর !'

দ্বিতীয় বুড়ো এতোক্ষণে কথা বললো, 'ইয়াসিনের বয়েস ? হারামজাদা আমাদের চেয়ে অনেক বাচ্চা, বঙ্কুবাবুর বাজারে লেংটা ঘুরে বেড়াতে দেখেছি ওকে। সে হিসেবে বয়েস ওর এই ধরুন গে,

পাঁচ কুড়ি চোদ্দ-পনেরো, এই আর কী।'

আমজাদ হেসে বললো, 'বাহ্, এ যে দেখছি খালি বয়েসের খেলা।' এ সময় দরজার কাছে ছায়া দেখা গেলো।

'না, বাপ, তোদের নিয়ে আর পারা গেলো না,' বলতে বলতে সাদা বাবরিচুল আর সাদা দাড়ির খুনখুনে এক বুড়ো তুলার দোকানের ভেতর ঢুকে পড়লো। লোকটাকে দেখেই দোকানের তিন বুড়ো তড়াক্ করে যার যার আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। বুড়ো বিগলিত হাস্যে প্রত্যেকের মাথায়-গালে-থুতনিতে হাত বুলিয়ে দিয়ে আদর করতে করতে বললো, 'কেমন আছিস বাপ-ধনেরা, অ্যাঁ! অনেককাল কোন খোঁজ-খবর দিস নাই, বাপ, তো ভাবলাম, যাই, একবার নিজেই গিয়ে—ইয়াল্লা, ইনি কে?'

আমজাদ অবাক হয়ে আগন্তুক বৃদ্ধের কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করছিলো। শত বর্ষের তিন বৃদ্ধ যেন এই বুড়োর কাছে দুগ্ধপোষ্য শিশু! ও হাসবে না কাঁদবে ভেবে পাচ্ছে না।

বুড়োর পরনে সবুজ লুঙ্গি আর ভারি খাটো ঝুলের সবুজ পাঞ্জাবী। বগলে বাঁশের বাঁটঅলা ছাতা। কাঁধে বড়োসড়ো হলুদ রঙের ঝোলা। টুকটুকে গায়ের রঙ আর ভীষণ তীক্ষ্ণ বাজের মতো একজোড়া চোখ। অটুট দাঁতের সারি—ঝক্ঝকে। নরোম ঝুল্ঝুলে গায়ের চামড়ায় এক ধরনের শেওলা-ধরা প্রাচীনত্ব।

চমকে ওঠে আমজাদ। আগন্তুকের প্রশ্নের উত্তরে ছাগলদাড়ি খলখল করে হেসে বলছে, 'জ্বী চাচাজী, ইনিই আমজাদ আলী, এঞ্জিনিয়ার। এনার কথা আপনাকে জানানো হয়েছিলো, শামুকভাঙা শিকারের জন্যে অরুণাকোট যেতে চাইছেন। ইয়াসিনের মুখে শুনলাম আপনি নাকি দয়া করে রাজি হয়েছেন, হে হে হে।'

আমজাদ ফিসফিস করে ইয়াসিনকে জিজ্ঞেস করলো, 'কে ?'

'ওস্তাদ আজিমুল্লা চাচা ! ইনার কাছেই আমাদের হাতেখড়ি ।' বলেই কেমন এক রকমের হাসি হাসলো ইয়াসিন ।

আমজাদ উল্লসিত হয়ে উঠে আজিমুল্লা চাচার সাথে মোসাফা করে বললো, 'বড়ো খুশি হলাম আপনার সাথে পরিচিত হয়ে ।'

বুড়ো ততোধিক উল্লসিত হয়ে বললো, 'আমিও আপনার সাথে পরিচিত হয়ে বড়ো খুশি হলাম, বাপধন ! মা-বাপ আছেন ? নেই ? আহা ! বউ-ছেলেমেয়ে ? অ, বিয়ে করেননি ? তাহলে তো ঝাড়া হাত-পা ! কী বলেন, বাপ, যেতে হলে আজই রওনা হতে হয়—'

আমজাদ বললো, 'আমি রেডি হয়েই এসেছি । ইনি বললেন, আজিমুল্লা চাচা আজ এসে আজই আবার ফিরে যাবেন, আমার ভয় হচ্ছিলো আপনি আদৌ আসবেন কিনা ।'

বুড়ো মমতাভরা চোখে আমজাদকে দেখতে দেখতে বললো, 'আমার ওখানে খুবই কষ্ট হবে আপনার, একা মানুষ, তায় আবার অথর্ব বুড়ো, যত্ন-আত্তি্য করতে পারবো না ঠিকমতো । তবে বাপ, খাওয়া-দাওয়ার কষ্টটা পুষিয়ে নিতে পারবেন । এই সিজনেও আমার অরুণাকোটে দশ-সেরি শামুকভাঙা মেলে ।' হেসে উঠলো ও । ঝক্‌ঝকে দাঁত দেখা গেলো ।

চশমাঅলা বুড়ো একটা হেলাফেলার ভাব নিয়ে বললো, 'চাচাজী, শুনলাম এবার নাকি আপনি বটি-দা কিনতে যাচ্ছেন ? খুব তো বাহাদুরি করে বলেছিলেন, বিশ বছরের ভেতরই বোঝা যাবে কার কুদরত কতোদুর ! আর এখন নিজে বটি-দা কিনতে যাচ্ছেন, ছেঃ !'

আজিমুল্লা হিংস্র আর নিঃশব্দ এক রকমের হাসি হেসে বললো, 'কার কাছে শুনলি, বাপ ?'

চশমা-বুড়ো ফ্যাকাসে হেসে বললো, 'সে যার কাছেই শুনে থাকি আপনাকে বলবো কেন? তবে এ-কথা জেনে রাখুন আমাদের নির্বাসন দিয়ে যারা—অক্ !' পাঁজরে একটা গুঁতো খেয়ে কথা-গুলো গিলে ফেললো সে।

ছাগলদাড়ি মোলায়েম হেসে নিরীহ স্বরে বললো, 'চাচাজী কি এগারোটার বাস ধরবেন? উহু, পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা গড়িয়ে যাবে। ইয়াসিন, কোথা গেলি হারামজাদা, নাস্তাপানির ব্যবস্থা কী করলি, অ্যাঁ! তোকে নিয়ে তো আর পারা গেলো না। এঞ্জিনিয়ার সাহেব চা খাবেন তো, না ফাণ্টা আনাবো?'

আমজাদ বিব্রত হেসে বললো, 'না না, চা-ই খাবো। আর শোনেন, এই যে, অ ইয়াসিন মিয়া, একটু ভালো মিষ্টি-টিষ্টি নিয়ে আসেন গিয়ে। আর, বিলটা আমাকেই দেবেন, কেমন?'

সেই ভীষণ ফর্সা আর সরু বুড়োটা নাস্তা আনতে বেরিয়ে গেলো।

চা খেতে খেতে দু'একটা প্রয়োজনীয় কথা জেনে নিলো আম-জাদ।

ছোট্ট এক অধিত্যকায় আজিমুল্লার নির্জন একতলা বাংলো। বুড়ো স্রেফ একা ওখানে থাকে। মাসে তিন-মাসে পাহাড় থেকে নেমে এসে তুলার দোকানে হাজির হয়। বঙ্কুবাবুর বাজারেই তাঁর চার-চারটে তুলার দোকান। দোকানের আয়েই দিন চলে যাচ্ছে, বরং প্রতিমাসেই বেশ কিছু করে ব্যাংকে জমা পড়ছে। জঙ্গলে ঘুরে-টুরে আর উই দিয়ে দোআঙ শিকার করেই দিন কাটে বুড়োর। মাঝে মাঝে শহুরে লোকজন গিয়ে চড়াও হয় তার ওখানে, তখন মচ্ছব!—কেউ শিকার করতে যায়, কেউ যায় নির্জনে গল্প উপন্যাস লিখতে।

শহুরে গ্যাঞ্জাম ভালো লাগে না বলে কেউ কেউ খোলা জায়গায় স্রেফ ঘুরে বেড়াতে ওখানে গিয়ে হাজির হয়। অবশ্য আজিমুল্লা চাচার বাংলোর ঠিকানা বড়ো সহজে কেউ পায় না। এই তুলার দোকানের এঁরা, যদি পছন্দ হয় তো কাউকে কাউকে ঠিকানাটা দয়া করে দেয়। এই হিসেবে ধরতে গেলে বলতে হয়, এঞ্জিনিয়ার আমজাদ আলী ভাগ্যবান ব্যক্তি, তাকে এঁদের পছন্দ হয়েছে।

ছাগল-দাড়ি খল্‌খল করে হেসে আবার বললো, 'চাচাজী, দেখবেন, যেন না শেষে ঠকা দেন! উহু, কতোদিন!'

আজিমুল্লা অধৈর্য হয়ে বললো, 'আঃর! তোদের নিয়ে আর পারা গেলো না, বাপ, বলেছিই তো--উফ্! এঞ্জিনিয়ার সাহেব, চলেন ওঠা যাক, অ্যাঁ!'

ব্যাগ আর বন্দুক হাতে তুলে নিলো আমজাদ। তিন বুড়োর সাথে হ্যাণ্ডশেক করে রাস্তায় নেমে পড়লো। একটা মিষ্টি সুর ওর কানে এসে আছড়ে পড়ছে। রিনরিনে সুরেলা গলায় গাইছে ইয়াসিন, কথাগুলো ঠিক বোঝা গেলো না, তবু এরকম যেন—কডকৃতারা ধান পাকলো পলাও খাইলাম না…

কেমন এক অস্বস্তিতে ঘামতে শুরু করে আমজাদ। বাংলোর কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা। শক্ত আর কালো রং করা লোহার গেট দেখা যাচ্ছে। বাংলোর চারধারে ঘন কাঁটাতারের বাউণ্ডারী। দশ-বারোটা বিশাল ধড়ের রেন-ট্রি এখানে-ওখানে হেলাফেলায় দাঁড়িয়ে আছে। আঁধার আঁধার, আর ভয়াল। শেষ বিকেলের মরা রোদ্দুর-ছটা গাছগুলোর বিশাল ধড় আর ডালপালায়, নিঝুম বাংলোর আনাচে-কানাচে আর চালের মাথায় হাসি ফোটানোর ব্যর্থ চেষ্টা

করছে। গেটের কাছের ছোট্ট এক জারুলের ডালে একটা প্যাঁচা বসে আছে চুপচাপ। দূরে ঝিঁঝি পোকার ডাক।

নিঃশব্দে হেসে উঠলো বুড়ো। বাঁ কাঁধ থেকে ঝোলাটা ডান কাঁধে নিতে নিতে বললো, 'এসে গেলাম, বাপ।'

বাংলোর উত্তর দিকটায় চোখ পড়তেই অস্বস্তিটা আবার পেয়ে বসে আমজাদকে। ওখান থেকে কি একটা স্যাঁত করে সরে গেলো। মানুষ!

চিন্তান্বিত চোখে আজিমুল্লার দিকে তাকিয়ে বললো, 'চাচাজী, আপনি বললেন এখানে আপনি একা থাকেন!'

বৃদ্ধ অবাক হয়ে বললো, 'এঞ্জিনিয়ার সাহেব, আমিতো ঝুট্ কথা বলি না। এখানে আমি একাই থাকি।'

'চোখের ভুল হতে পারে', চিন্তিত ... বললো আমজাদ, 'তবু আপনার সাবধানতার জন্যে ব্যাপারটা বলা দরকার, চাচাজী। একটা বুড়ো-মতো লোক ওই ওদিককার দেয়ালের দিকে চুপকে সরে গেলো যেন! চোর-টোর নয়তো?'

আজিমুল্লা হাসলো। আশ্বাসের হাসি, 'কি দেখতে কী দেখেছেন, বাপধন, এখানে মানুষ আসবে কোথা থেকে। শামুকভাঙা-টাঙা হবে হয়তো, দানা খেতে গাছ থেকে ঝপ করে মাটিতে নেমে পড়েছে। চলেন।'

কিন্তু শামুকভাঙা কি এসময় মাটিতে নামে? যাক বাবা, যার গরজ তার গরজ, আমার কী! কাঁধে-ফেলা বন্দুকটা শক্ত করে ধরে হা হা করে হেসে উঠে গেটের ভেতর পা রাখে আমজাদ।

বিশাল বাংলো। চুন-সুরকির চওড়া গাঁথুনি। অনেক উঁচুতে উঁচুতে জানালাগুলো। দরজা আর জানালায় ভারি জাম কাঠের

পাল্লা। আলকাতরার পরিচিত গন্ধ। বাড়িটার তিনদিক ঘিরেই রেলিংঅলা চওড়া বারান্দা—পুব দক্ষিণ আর উত্তরমুখী। অনেক-গুলো ঘর। বেশিরভাগই তালাবদ্ধ।

পুব-উত্তরের দুটো ঘর নিয়ে আজিমুল্লা থাকে। তার লাগোয়াই বাথরুম আর রান্নাঘর। রান্নাঘরের ভেতর ছোট্ট একখানা ডাইনিং টেবিল। বৃদ্ধ এখানে বসেই খাওয়া-দাওয়াটা সেরে নেয়। অবশ্যি এর পুবের দরজা দিয়ে ঢুকলে বিশাল ডাইনিং হলটা চোখে পড়ে।

দক্ষিণ পার্শ্বের ছোট্ট ছিমছাম একখানা ঘর বরাদ্দ হয়েছে আমজাদের জন্যে। পুব আর দক্ষিণ দিকে উঁচু উঁচু জানালা। ঘরের দরজা খুললেই পুবদিকের বারান্দা। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেই অরুণাকোটের গহীন জঙ্গল। সেখানে শিশুগাছ, শাল-সেগুন আর কাঠ-বাদামের ভিড়। বনে হরেক রকমের অজস্র লতাপাতা ঝোপ-ঝাড় আর ছোটবড়ো গাছ। বুকচাপা নির্জনতায় ওরা ফিসফাসে কথা বলে, গান গায়। উদাসী বসন-খোঁড়ল উড়ে বেড়ায় এখানে ওখানে। সাঁঝের আগেভাগে এসে ঢোকে গাছের খোঁড়লে।

সিলেট থেকে ভেড়ার গোশত কিনে এনেছিলো বৃদ্ধ। রাতের খাওয়াটা হলো গ্র্যাণ্ড। সরু-চালের ভাত আর ভেড়ার গোশতের ভুনা, সাথে মুসুরী ডালের একটা ক্ষীর আর জলপাইর আচার। খাওয়ার টেবিলে সারাক্ষণ বুড়োর রান্নার তারিফ করলো আমজাদ, আর বুড়ো বিনয়ে কাঁচুমাচু হয়ে নিঃশব্দে খালি হাসলোই।

খাওয়ার পর নিজের ঘরে ঢুকে বন্দুকটা নিয়ে বসলো ও। আজি-মুল্লা বলেছেন ইচ্ছা করলে ভোরে উঠেই শিকারে বেরিয়ে পড়া যায়। টোটাগুলো ঠিকঠাক করে বন্দুকে গ্রীজ-ট্রিজ মাখিয়ে রেডি করে রাখলো। তারপর ঘুম। অরুণাকোটের জঙ্গলে ওর প্রথম

রাত।

ঘুম ভাঙলো সকাল দশটায়। বোকা বোকা চোখে কিছুক্ষণ ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলো ও, তারপর খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো। ঝক্‌ঝকে আকাশ—নীল অপরাজিতার মতো। আসমানের অনেক ওপরে সূর্য উঠে এসেছে।

দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই উত্তরের বারান্দার কোণের দিকে চোখ যায় ওর। শুধুমাত্র একখানা লুঙ্গি পরে চেয়ারে বসে আছে আজিমুল্লা। খালি গা। বয়েসের ভারে কুঁজো হয়ে গেছে বুড়ো। ছোট্ট একটা ছুরি দিয়ে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে। লম্বা সরু সরু আঙুলে ভীষণ বাঁকা আর তীক্ষ্ণ নখগুলো স্পষ্ট। আমজাদের দিকে চোখ পড়তেই হাসলো,'কী, এঞ্জিনিয়ার সাহেব, ঘুম ভাঙলো এতোক্ষণে!'

আমজাদ ঘুম-ঘুম গলায় বললো, 'বড়ো ঘুমিয়েছি কাল রাতে। ভোরে ডাকেননি কেন?'

'খুব হয়রানি গেলো তো কাল, ভাবলাম একটা দিন বাপধন বিশ্রাম নিন। আজ আর শিকারে গিয়ে কাজ নেই, কী বলেন? চারদিকটা ঘুরে-ফিরে দেখেন, ভালো লাগবে।' তারপরই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো বুড়ো, 'উফ, আপনার চা দেয়া হয়নি। নিয়ে আসছি, দাঁড়ান। বরং ততোক্ষণে হাতমুখটা ধুয়ে নিন, অ্যাঁ?'

বুড়োকে যতোই দেখছে ততোই অবাক হচ্ছে ও—অসম্ভব রকমের বয়েসঅলা এই থুনথুনে বুড়ো এতো চট্‌পটে আর প্রাণশক্তিতে অমন ভরপুর হয় কেমন করে? মাঝে মাঝেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে আমজাদের, হারামী বুড়ো টিলার নিচের ঝর্না থেকে বড়ো বড়ো

বালতি ভরে পানি বয়ে নিয়ে আসছে—স্বচক্ষে দেখেছে !

একটা কেঁদ-গামহারের নিচে অনেকক্ষণ বসে থাকে আমজাদ। বেড়াতে বেড়াতে অনেকদূর চলে এসেছে, বাংলোয় ফেরার তাড়াও তেমন নেই। এখানটা প্লাসি-ওয়েস্ট-এর আওতায়, আগে-চলা থেকে আঠারো মাইল উত্তরে। এখানকার বনে বাতাস বয় অনেক ওপর দিয়ে, তখন জঙ্গলের ভেতর কেমন সরসর শব্দ হয়, মনে হয় এক অশরীরী আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে অরূণাকোটের এখানে-ওখানে। গা ছমছম করে ওঠে। এ পর্যন্ত আটটা শামুকভাঙা দেখতে পেয়েছে ও, উত্তরের পাহাড় থেকে উড়ে এসেছে ওরা। বন্দুক সাথে থাকলে এতোক্ষণে সবগুলোকেই নামিয়ে দেয়া যেতো। বুঝতে পারছে বুড়োর কথায় বন্দুক না নিয়ে এসে ভুল করেছে। আরো কতোক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে শেষে উঠে পড়ে। সেই অস্বস্তিটা আবার জেগে উঠছে। ঘেসো বন-পথে সাদা বালি কোথাও কোথাও। সেখানে একজোড়া বাঁকানো খালি পায়ের ছাপ। টাটকা! কেউ ওখানে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করছিলো। ও উঠে দাঁড়ানোর সাথে সাথেই পালিয়েছে। ভুরু কুঁচকে পায়ের ছাপটার দিকে ও তাকিয়ে রইলো,—আজিমুল্লা চাচা-ই কি? উঁহু*। কে?

অরূণাকোটের এই গহন অরণ্যে আজিমুল্লা ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ আছে বলে তো মনে হয় না। কাল বিকেলে বাংলোয় ঢোকার মুখে (আজিমুল্লার কথায় চোখের ভুলে) এক রহস্যময় বুড়োকে দেখতে পেয়েছে বটে, পায়ের ছাপটা কি ওই বুড়োর? দ্রুত বাং-লোয় ফিরে চললো আমজাদ।

বাংলোয় ঢুকেই ভীষণভাবে চমকালো ও। উত্তরের বারান্দায়

জামশেদ মুস্তফির হাড়

আজিমুল্লার মুখোমুখি পা গুটিয়ে উবু হয়ে বসে আছে একজন। ফিসুফিস্ করে কথা বলছে আজিমুল্লার সাথে। বুড়ো-আজিমুল্লা বাইরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছে বলে আমজাদকে দেখতে পায়নি। লোকটা হঠাৎ চোখ তুললো। তারপর আমজাদকে দেখেই অস্ফুট শব্দ করে লাফিয়ে উঠে দরজার আড়ালে চলে গেলো। স্পষ্ট দেখতে পেলো আমজাদ—লোলচর্মের ভীষণ বুড়ো এক লোক! চুল-দাড়ি আর গোঁফ ভুরু-টুরু সব সাদা। নড়বড়ে পায়ে কেঁপে কেঁপে তড়িতে ওপাশের দরজার দিকে গা ঢাকা দিয়েছে।

উত্তেজিতভাবে আজিমুল্লার দিকে এগিয়ে গেলো ও, গম্ভীর গলায় বললো, 'এর মানে কী, চাচাজী?'

'কী বিষয়, বাপধন? কিসের মানে?' বৃদ্ধ মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞেস করলো।

'এখানে আরেকজন কেউ আছে, বুড়ো লোক। এতোক্ষণ বসে বসে আপনার সাথে গল্প করছিলো। আমাকে দেখেই লুকিয়ে পড়লো। এদিকে আপনি বলছেন, বাংলোয় আপনি একা থাকেন। এই লুকোচুরির মানে জানতে চাইছি।'

বুড়ো কাঁচুমাচু মুখ করে বললো, 'আপনাকে বাপ বলিনি ভয় পাবেন বলে।'

'ভয়!' একটা হিমশীতল স্রোত বয়ে যায় ওর শিরদাঁড়া বেয়ে। কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, 'কেন, ভয় পাবো কেন?'

'হারামজাদার গায়ে অসুরের শক্তি।'

'তাতে কী।' আমজাদ বোকা বনে গিয়ে বলে।

'তাতে অবশ্যি কিছু না। তবে ও বড়ো লোভী।'

'চাচাজী, আপনি খুব আবোল-তাবোল বকছেন।'

'আবোল-তাবোল। তা হবে, বাপ। বয়েস হলো তো!'

নিরীহ মুখ করে উঠে পড়ে ও। বলে, 'ধরা-ই যখন পড়ে গেলো তো ডাকি মজমিলকে, ডাকবো?'

'ডাকেন।'

আজিমুল্লা ফ্যাঁসফেঁসে স্বরে ডাকলো, 'আয়, বাপ, এদিকে বেরিয়ে আয়।'

নড়বড়ে পায়ে টলে টলে দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো নতুন বুড়োটা। দেখে শিউরে উঠলো আমজাদ। বয়সের ভারে হাত-পায়ের গিঁটগুলো খুলে খুলে যাবে যেন। মুখের আর হাতের চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ; নীল শিরাগুলো ফুলে আছে। পাতলা টুক্-টুকে ঠোঁট, আর সেই ঠোঁটের ফাঁকে ধারালো ঝক্‌ঝকে দাঁতের সারি। কপালের ঝুলন্ত চামড়ায় চোখ দুটো প্রায় ঢেকে গেছে।

আমজাদ স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়েছিলো বুড়োটার দিকে, শেষে আচ্ছন্নের মতো বললো, 'ওনার বয়েস কতো হবে?'

'মজমিল আমার চেয়ে দশ-পনেরো বছরের বড়ো হবে,' আজিমুল্লা হাসলো। বিতৃষ্ণায় গা-টা রিরি করে উঠলো আমজাদের, মজমিলের একদম কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বললো, 'আপনার গায়ে নাকি অসুরের শক্তি, দেখিতো হাতটা।'

বুড়োর নরোম ন্যাল্‌খ্যালা হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে তীব্র আক্রোশে সজোরে চাপ দিলো ও। হাড়গুলো মুড়মুড় করে উঠলো। খল্‌খল্ করে হেসে উঠলো মজমিল মিয়া, মাটির দিকে চোখ নামিয়ে হিসফিসে সুরে বললো, 'বেতা লাগে না।'

ঘিনঘিন করতে লাগলো গা। নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে এলো।

আমজাদ।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে দু'ঘণ্টার মতো ঘুম। ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে এককাপ চা খেলো ও। তারপর প্যান্ট-শার্ট গায়ে দিয়ে পকেটে দুটো টোটা ভরে বন্দুক কাঁধে ফেলে জঙ্গলের দিকে হাঁটা লাগালো। দেখেছে ও বাংলোর ঘেরের ভেতর থাকলে অস্বস্তির যে কাঁটাটা খচখচ করে, জঙ্গলে বেরিয়ে পড়লেই তা বেমালুম উবে যায়। আজিমুল্লা লোকটা আসলে কে? মনস্থির করে ফেলেছে ও, শিকারে আর কাজ নেই, আগামীকালই এখান থেকে ভাগবে।

অনেকক্ষণ জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করে সন্ধ্যার আগে বাংলোয় ফিরতেই বুকটা ধক্ করে উঠলো। তৃতীয় বুড়োটাকে দেখতে পেয়েছে ও! ভীষণ বেঁটে আর ছোট্ট এতোটুকুন! জ্বলজ্বলে চোখ। ওকে দেখে নিঃশব্দে বারান্দার ওপাশে লাফিয়ে পড়লো!

বিপদের গন্ধ পাচ্ছে আমজাদ। একটা হিমেল শিরশিরানির অনুভূতি ওর সারা শরীরে। বুড়োটা এলোই বা কোত্থেকে, আর অমন দৌড়ে পালালো কেন!

বন্দুক টেবিলের ওপর শুইয়ে রেখে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ও। লোকটাকে খুঁজে বের করতে হবে। রান্নাঘর থেকে খুটখাট আওয়াজ ভেসে আসছে। আজিমুল্লা আর মজমিলের ফিসফাস কথাবার্তা, খলখল হাসি।

বারান্দার রেলিং বেয়ে ও নিচে নেমে এলো। খুদে বুড়োটা বাগানের উত্তর দিক দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলো ও। বাংলোর এদিকটায় খালি জঙ্গল। সরু ধড়ের শাল গাছের ভিড়। ঝোপঝাড়। একটু দূরেই কাঁটা-তারের দুর্ভেদ্য বাউ-

ওরা। তন্নতন্ন করে খুঁজলো ও বুড়োটাকে।

আশ্চর্যভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছে লোকটা। গা শিরশির করছে আমজাদের। পশ্চিম দিকের সিঁড়ি দিয়ে বাংলোয় উঠে আসতে আসতে ভাবলো আজিমুল্লাকে চেঁচিয়ে ডাক দেয়। হঠাৎ কী দেখে চুপ করে গেলো।

পশ্চিম প্রান্তের সর্বশেষ ছোট্ট ঘরটি বাংলোর ভঁাড়ার ঘর। উত্তর আর পশ্চিমের দেয়ালে দুটো ছোট্ট জানালা ছাড়া আর কিছু নেই। একমাত্র দরজাটা আজিমুল্লার বেডরুমের দিকে।

নিঃশব্দে দেয়ালের থাম ধরে পশ্চিম দিকে ঝুলে পড়লো ও। তার-পর জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর উঁকি মেরেই অস্ফুটে চিৎকার করে উঠলো। ভয়ে গায়ের রোম সব খাড়া হয়ে উঠেছে;—শেষ বিকেলের মরা রোদ্দুরে ম্লান ঘরখানার ভেতর দু'খানা ছোট্ট বেঞ্চিতে চাপা-চাপি করে বসে আছে দশজন খুনখুনে বুড়ো। কান খাড়া করে চুপচাপ বসে আছে তারা, মাঝে মাঝে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। সন্দিগ্ধভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

বিনবিন করে ঘামছে আমজাদ। পা টিপে টিপে নিজের ঘরে ফিরে এসেই দড়াম করে দরজাটা লাগিয়ে দিলো। সবগুলো ছিট-কিনি লাগিয়ে কড়াদুটোও রুমাল দিয়ে কষে বেঁধে ফেললো। তার-পরই হঠাৎ টেবিলের দিকে চোখ গেলো—বন্দুকটা নেই! উঠিয়ে নিয়ে গেছে কেউ!

হাউমাউ করে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। হঠাৎ খেয়াল করলো, ঘুম পাচ্ছে তার!

রাত ঠিক একটা পঁয়ত্রিশে ঘুম ভাঙলো। কোথা থেকে মিহি, খুবই

মিহিন আর ধুলোবালির মতো—ঠিক ধুলোবালিও না, কেমন অস্পষ্ট নরোম পালকের মতো উড়ে আসা মিষ্টি একটা সুর কানে এসে আছড়ে পড়ছে—বুকটা ধক্ করে উঠলো আমজাদের। দুর্বল গলায় ফিস্‌ফিসিয়ে বললো, 'ইয়াসিন···ইয়াসিন···'

আর তখন, ঠিক তখনই ঘরের বাইরে আস্তে আস্তে এসে থেমে গেলো চোদ্দজোড়া পায়ের আওয়াজ!

পতঙ্গ-রহস্য

[পতঙ্গটাকে খাওয়ার পরপরই রহস্যজনকভাবে মারা গেলো কুটির পোষা টিয়ে হিটলার। কেন?]

কুটি কবিরাজ গাইছিলো, ধরা পড়িয়াছি দয়াল ভবের মহাজালে। বেশ দরদ দিয়েই গাইছে ও। আমার ধনফকীর লেনের ছোট্ট বাড়ি-খানা কুটি কবিরাজের বুক হু-হু-করা গানের সুরে ফুঁপিয়ে উঠছে। এরই মাঝে খেয়াল করে দেখি আমার চোখ দুটি ভেজাভেজা। হতভাগা পরের কলিগুলো গাইছিলো এরকম করে—ওগো দয়াল, আমি তো তেমন বড়ো কোন রুই কাতলা নই যে জালের রশি ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবো, নিতান্ত খলশে পুঁটি, আমার সে শকতি কোথায়? তাই আমাকে জালের ফাঁক-ফোঁকর খুঁজে খুঁজে মরতে হয়। কিন্তু নিঠুর হে, এমনই তোমার জাল যে সেখান দিয়ে শুধু পানি ছাড়া কিছু গলে যাওয়ারও উপায় নেই···

গান শেষ করে খুব উদাস দৃষ্টিতে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে চুপ-চাপ বসে রইলো কুটি। ইদানীং ওর মধ্যে একটা বৈরাগ্যভাব এসে-ছে। প্রায়ই আঙুলের গিঁট গুণে গুণে নিজের বয়েস হিসেব করতে বসে। আর গণনা শেষ করেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেঁদো হাসি হেসে বলে, এবার ভাঙা তরী ভাসিয়ে দেয়ার সময় হলো হে।

আমি কিছু বলি না, শুধু মনটা খারাপ হয়ে যায়। কুটি এতো মৃত্যুচিন্তা করছে কেন? নাকি···

নিজের বয়েসের ব্যাপারে আমার কোন চিন্তা-ভাবনা নেই। অনিত্য জগৎ-সংসারে এই অকরুণ কালের গতিকে রোধ করে কে? কিন্তু কুটি যদি না থাকে! কুটি যদি মরে যায়? আমি ভয়ে ভয়ে

কুটির মুখের দিকে তাকালাম।

এসময় কুটি ধড়মড় করে উঠে বসে বললো, 'বড়ো ভুখ লেগেছে তুলু, শিশুমিয়া ফেরার আগেই না হয় তুমি তশতরিতে করে একহাতা ভাত আর একটু কোরমা নিয়ে এসো, অম্লশূলের বেদনাটা চাড়া দিয়েছে।'

আমার ধনফকীর লেনের বাসায় আজ কুটি কবিরাজের দুপুরের খাবারের দাওয়াত। শিশুমিয়া রাঁধা-বাড়া শেষ করে কুটির পোষা টিয়েপাখির আধার যোগাড়ের জন্যে দুবড়িহাওর গেছে। এখুনি ফিরবে বোধহয়। প্রতি একশ' কীট-পতঙ্গের জন্য ও কুটির কাছ থেকে দশ টাকা করে নেয়।

একটা তশতরিতে করে অল্প কিছু ভাত আর কোরমা-করা এক টুকরা ভেড়ার গোশত এনে দিলাম কুটিকে। দাওয়াতের জন্যে আজ আখনি-পোলাও করেছে শিশুমিয়া, আর ভেড়ার গোশতের কোরমা, সাথে চারটে রাজহাঁসের ডিমের ভুনা, খিরার সালাদ। মেনুর পুরোটাই কবিরাজের বাতলে দেয়া। ভেড়ার গোশতটা ওর প্রিয় খাবার।

খেতে খেতে কুটি বললো 'মক্কাটা একবার ঘুরে আসলে কেমন হয়, তুলু?'

'হজের কথা বলছো?' আমি চোখ পিটপিট করলাম।

'হুঁ, এছাড়া আর কী!'

'তা যাওয়া যায়। এবারই কী?'

'কর্তব্য-কর্মে যতো শীঘ্র বেরিয়ে পড়া যায় ততোই মঙ্গল।'

দরজার কাছে ছায়া দেখা গেলো। শিশুমিয়া ফিরে এসেছে। ঘরে ঢুকেই ও টেবিলের ওপর পকেট উজাড় করে দিলো। নানা

জাতের নানা আকারের অন্তত শ'দুয়েক পোকা-মাকড়—সবগুলোই মৃত। কুটি বললো, 'শাবাশ শিশু!'

শিশুমিয়া ভয়-পাওয়া-চোখে টেবিলের ওপর থেকে ছোট্ট একটা পোকা উঠিয়ে নিয়ে হাতের তেলোয় রেখে বললো, 'কবিরাজ চাচা, এটাকে দেখেন, বড়ো আশ্চর্য পতঙ্গ!'

কুটি বললো, 'পাগলা, এটা তো গুবরে-র বাচ্চা! এটাতে আশ্চ-র্যের কী দেখলি?'

আমি তীক্ষ্ণ চোখে শিশুর হাতের তেলোর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ওখানে নিথর হয়ে পড়ে আছে কুচকুচে কালো পোকাটা—ছোট্ট। মাশকলাই-এর দানার চেয়ে বড়ো নয়। শক্ত খোলঅলা শরীর, পেছনের দিকে একটা মাত্র দাঁড়া। মস্তক ধড় আর লেজ—সব একা-কার। পা বা শুঁড়—কিছু নেই।'

আমি কুটিকে বললাম, 'কুটি, এটা ঠিক গুবরে নয়, এর বে-ধারা আঙ্গটটা দেখো! খুব ভয়ানক মনে হচ্ছে।'

কুটি পোকাটাকে শিশুর তেলো থেকে নিজের হাতে নিয়ে নিরী-ক্ষণ করতে করতে কেমন গম্ভীর হয়ে গেলো। শেষে কতোক্ষণ পর বললো, 'পতঙ্গটাকে মেরে ফেললি কেন, জ্যান্ত থাকলে এর ঘোরা-ফেরা দেখেই বোঝা যেতো কী রকমের পোকা এটা।'

শিশুমিয়া চোখ বড়ো বড়ো করে বললো, 'আমি তো মারি নাই, চাচা, এই দ্যাখেন অবস্থা—'

ও নিজের শার্টের পকেটটা দেখালো। নিচের দিকে কালো একটা ফুটো। বললো, 'ব্যাটা উড়তে উড়তে পিয়ালের ডালে ঠোক্কর খেয়ে টপ করে আমার মাথায় এসে পড়লো। আমি তুলে নিয়ে পকেটে রেখে হাওরের পানিতে নেমেছি দেখি পকেট ছেঁদা

করে পানিতে পড়ে গেছে। পড়েই মরে গেলো। বড়ো আশ্চর্য এক শক্তি আছে চাচাজী এই পতঙ্গের। শরীর থেকে এক রকমের বিষ ছাড়তে পারে বোধহয়, নইলে শার্টের পকেট ছিঁড়ে বেরিয়ে যায় কেমন করে!'

আমি বললাম, 'হতভাগা, তোমার পকেট এমনিতে ছেঁড়া থাকতে পারে না নাকি?'

শিশুমিয়া বললো, 'কসম আল্লার!'

কুটি পোকাটাকে সাবধানে তার জোব্বার সাইড পকেটে রাখতে রাখতে বললো, 'যাক, যা হবার হয়েছে, এবার চলো, চারটে খেয়ে নেবো। আমাকে আবার তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। দেরি হয়ে গেলে হিটলার চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় তুলবে।

কুটির পোষা টিয়ের নাম হিটলার।

তিনদিন পর কুটি কবিরাজের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। চিঠিটা নিয়ে এসেছে জাফলং-এর এক ঘাসঅলা।

কুটি লিখেছে: ''সম্প্রতি আরেক দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছি। শিশু কর্তৃক আনীত সেই অদ্ভুত কীটের কথা তোমার স্মরণে আছে কি? ভাই, তুলু, ঘটনার কোন মনঃপুত ব্যাখ্যা খুঁজিয়া না পাইয়া বড়োই দুর্বল বোধ করিতেছি। পত্রপাঠ প্রথম বাস ধরিয়া জাফলং চলিয়া আসো। ইতি।''

চিঠিটা শেষ করে ভাবতে লাগলাম। দুর্ঘটনা বলতে কি বোঝাতে চাইছে কুটি? সেই 'অতীব বিচিত্র ঘটনা-টটনা' নয়তো! হতভাগা কোথাথেকে যে রোমহর্ষক সব কাণ্ড-কারখানার সন্ধান পেয়ে থাকে! প্রাচীন-বালকের হত্যাকাণ্ডের পর ইদানীং ও একটু মিইয়ে গেছে,

নূতন কিছু আদৌ কী ঘটবে !

জাফলং লাইনের দ্বিতীয় বাস ধরে দুপুরের আগেই কুটির বাংলোয় পৌঁছে গেলাম।

নির্জন-এর গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে কবিরাজ। আমাকে দেখে ফ্যাকাসে হেসে অভ্যর্থনা জানালো, 'আসো, তুলু।'

দেখলাম কুটি দরদর করে ঘামছে। আমার কাঁধে একটা হাত রেখে দুর্বল গলায় বললো, 'একটা সর্বনাশ হয়ে গেলো, তুলু। খুব বড়ো রকমের সর্বনাশ !'

আমি বললাম, 'কিসের কথা বলছো ? তোমার কি হয়েছে, কুটি !'

'আমার কিছু হয় নাই।' ও মাথা [illegible] আবারো ফ্যাকাসে হাসলো, 'চলো, আমার ল্যাবরেটরিতে আছে, ওখানে গেলেই দেখতে পাবে।'

কি জানি ব্যাপারটা আমার ঠিক ভালো লাগলো না। হাঁটতে হাঁটতে বুঝতে পারি এই গ্রীষ্মকালেও কেমন একটা শীত শীত অনুভূতি সারা শরীরে।

ওয়াসেক মিয়াকে দেখা গেলো একটা দরজা দিয়ে উঁকি মারছে। কুটি একটু এগিয়ে যেতেই আমার দিকে চোখ ইশারা করে ডাকলো ও, তারপর আঙুল দিয়ে নিজের মাথায় তিনটে টোকা মেরে জানালো, কবিরাজ চাচার মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। কিছু একটা এই বেলা করে ফেলা দরকার, মানে, হাসপাতাল-ফাসপাতাল…

আমি কুটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম বিশাল এক লাশ, এ যদি পাগল হয়ে যায় তো সামলানো মুশকিল হবে। ঘামতে লাগলাম।

কবিরাজের ল্যাবরেটরি বাংলোর শেষ মাথায়। সরু প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে হেঁটে ল্যাবরেটরিতে এসে পড়লাম। এদিকটা বেশ নির্জন। নৈঃশব্দেরও যে এক রকমের শব্দ আছে, তা এখানে এসে দাঁড়ালে বোঝা যায়। ভেতরে ঢুকতেই কুটি নিঃশব্দে দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। বললো, 'তোমাকে জানানো হয়নি, তুলু, গত পরশু হিটলার মারা গেছে।'

দেখো হালত! এতোক্ষণ পর একটা স্বস্তির শ্বাস ফেললাম, 'উফ্। এই তোমার খুব বড়ো রকমের সর্বনাশ? হিটলার মারা গেছে তো কী হয়েছে, যদি বলো তো অরুণাকোটের বন থেকে এক ঝাঁক টিয়ে ধরে এনে দেবো।'

কুটি উত্তেজিতভাবে হাসলো, 'হিটলারের জন্যে আমি দুঃখিত হইনি, তুলু, এই পোকাটাকে দেখো, এর জন্যেই বলছিলাম, বড়ো একটা ক্ষতি হয়ে গেলো।'

এক্ষণে আমি অবাক হয়ে পোকাটার দিকে তাকাই। সেই ছোট্ট কালো পোকা, যেটাকে শিশু দুবড়িহাওর থেকে ধরে এনেছিলো। একটা তশতরির ওপর যত্ন সহকারে রাখা হয়েছে ওটাকে। দ্বিখণ্ডিত।

কুটি জানালো হিটলার গত পরশু পতঙ্গটাকে খায়। খাওয়ার সাথে সাথেই নাকি আশ্চর্যভাবে মারা যায় ওটা। মৃত কীটটা হিটলারের উদর ভেদ করে বেরিয়ে এসেছিলো। কুটি বেশ একটা কৌতূহল নিয়ে পোকাটাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলো। আজ ভোরের দিকে একটা অপরিকল্পিত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে স্তম্ভিত হয়ে যায় ও। পুরো একঘন্টা তার বাক্‌শক্তি স্ফুরিত হয়নি।

একটা মাইক্রোস্কোপ নিয়ে নাড়াচড়া করতে করতে বললো কুটি, 'কীটটাকে ঘিরে দুর্বোধ্য এক কুহেলিকা কাজ করছে, তুলু, এর

রহস্য ভেদ করতে তোমার সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করছি।'

আমি বললাম, 'কুটি, কোন খারাপ কিছু না তো?' কপালের কাছে আবার সেই চিনচিনে ঘামটা দেখা দিয়েছে।

বাঁ হাতের চেটো দিয়ে গলার কাছের ঘাম মুছতে মুছতে হাসলো ও, 'নাহ্, তেমন কিছু না, তবে অন্য হিসাবে ভয়ঙ্কর মারাত্মক একটা ব্যাপার তো বটেই। এই মাইক্রোস্কোপের নল দিয়ে ভেতরের দিকে তাকাও, তুলু, তাকিয়ে আমাকে বলো কি দেখা যাচ্ছে।'

কালো পোকাটাকে লো-পাওয়ারে নিয়ে ফোকাস্ করেছে কুটি কবিরাজ। দ্বিধান্বিত পায়ে একটুখানি হেঁটে গিয়ে মাইক্রোস্কোপে চোখ রাখলাম। গা-টা শিরশির করে উঠলো। মুখ দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে এলো, 'ইয়াল্লা!' বনবন করে ঘুরছে মাথা।

আইপিস্ থেকে চোখ উঠিয়ে বিস্ফারিত চোখে স্লাইডে রাখা দ্বিখণ্ডিত পতঙ্গটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কুটি 'কী দেখলে, তুলু?' বলতেই আবার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। এতোক্ষণ ধরে যেটাকে আমি ছোট্ট কালো একটা পোকা ভাবছিলাম আসলে সেটা অভিনব একটা স্পেস-শিপ। ভেতরে তিনজন ক্ষুদে মানুষ চুপচাপ মরে পড়ে আছে। নভোযাত্রীরা যে রকম পোশাক পরে ঠিক সে রকম স্পেস-স্যুট-টুট তাদের পরনে। নানারকম যন্ত্রপাতিতে নভোখেয়ার ভেতরটা ঠাসা।

উত্তেজনায় আমার শরীর থরথর করে কাঁপছে। ফ্যাঁস্ফেঁসে গলায় বললাম, 'কুটি, আসলে এটা কোন পোকা নয়, খুব সম্ভব ভিনগ্রহ থেকে উড়ে আসা একটা খুদে নভোযান!'

কুটি 'আল্লাহু কাদির' বলে আমার কাঁধের কাছটা জোরসে খিমচে ধরলো।

অচিরেই

রহস্য, রোমাঞ্চ, অ্যাডভেঞ্চারে ভর

জাফর চৌধুরীর

বাঙ্গালী দুই ভাই, রেজা মুরাদ আর সুজা মুরাদ। বাবা-মায়ের সংে
বেপোর্ট-এ। বাবা মিস্টার ফিরোজ মুরাদ দুঁদে গোয়েন্দা। বাবার ম
সুযোগ পেলেই রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা চালায়, ভয়ংকর বিপদে ঝাঁপি
ওই দুই তরুণকে নিয়েই জাফর চৌধুরীর এবারের কাহিনী, রোমহর্ষক

প্রথম বই :

যাও এখান থেকে !

ছুটি কাটাতে বেরিয়েছিলো দুই ভাই, রেজা আর সুজা।
রুক্ষ, ঊষর অঞ্চলে ঢুকে খারাপ হয়ে
গেল গাড়ি, ধুঁকতে ধুঁকতে পৌঁছলো ছোট্ট ওয়েস্টার্ন শহর
অ্যাক্সরেড-এ। তাদের উদ্দেশ্য জেনে থমকে গেল মেকানিক।
দাবানলের মতো খবর ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত শহরে। তাজ্জব হয়ে
গেল দুই ভাই। যার কাছেই যায়, এক কথা : যাও এখান থেকে !
প্রথমে সাবধান করা হলো ওদের, তারপর এলো আঘাত।
সারা শহরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো দুই ভাই, বোকার মতো
চ্যালেঞ্জ করে বসলো মহাপরাক্রমশালী, খুনী, ভয়ংকর
শত্রুকে। প্রাণের পরোয়া করলো না...

আসছে

। কিশোর থ্রিলারের নতুন সিরিজ

'রোমহর্ষক'

গ থাকে আমেরিকার পূর্ব উপকূলের ছিমছাম সুন্দর শহর
।তোই গোয়েন্দা হতে চায় দুই ভাই, অ্যাডভেঞ্চার পাগল।
য়ে পড়ে, হয় মৃত্যুর মুখোমুখি। বেপরোয়া, দুর্ধর্ষ, সুদর্শন
সিরিজের

দ্বিতীয় বই ঃ

বিষধর

গভীর রাতে ঘুম থেকে টেনে তুলে রেজা আর সুজাকে চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে চললো তাদের বন্ধু আকরাম। চিড়িয়াখানার গবেষণাগারে কাজ করে সে।

শোনা গেল বিপদ সংকেত ঃ খাঁচা থেকে পালিয়েছে সদ্য আনা এক মারাত্মক বিষধর কালকেউটে।

বিষ ছড়িয়ে পড়লো ডক্টর ডেনমারের রক্তে।

আতংক ছড়িয়ে পড়লো শহরে।

ফাঁসিয়ে দেয়া হলো বেচারা আকরামকে।

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলো দুই ভাই।

দেখা যাক কি হয়!

ফারিয়া

২১৫, চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম।

অসংখ্য ধন্যবাদ সেবাকে। 'হার বেনি', 'নও শুধু ছবি', 'সোনালী গরল', 'অনুরূপা'র মতো চমৎকার হৃদয়স্পর্শী বই উপহার দেয়ার জন্যে।

কাজীদা, সেদিন মিনাবাজার হলো চট্টগ্রামের একটি স্কুলে। সেখানে স্টলে 'অনুরূপা' বইটি দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। কিনে ফেললাম ডবল দাম দিয়ে।

সোহেল

৪নং রজনী চৌধুরী রোড, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা।

ছোটবেলায় নিছক অভিযান কাহিনী হিসেবে 'রবিনসন ক্রুসো' পড়েছিলাম। কিন্তু বইটিকে ও ডিফোকে নূতন ভাবে মূল্যায়ন করতে শিখলাম ইংরেজী বিভাগে প্রথম বর্ষে এসে। বেকনের রচনাবলী ও ডিফোর ঘর ছাড়ার বাণীই ছিলো বৃটিশ উপনিবেশবাদের প্রধান প্রেরণা। ছোটভাইকে জন্মদিনে উপহার দেয়ার জন্য বইটা খুঁজতে

গিয়ে বইটা কোথাও পাওয়া গেল না। পথে ঘাটে যে ক'টি স্টল চোখে পড়েছে, সবগুলো ঘাঁটা শেষ। অবশ্য সেবা বাংলা বাজারের বৃদ্ধ ভদ্রলোক জানালেন যে, বইটা শেষ হয়ে গেছে। যদি তাই হয় তবে আপনাকে অনুরোধ করছি বইটা যত শীঘ্র সম্ভব পুনর্মুদ্রণ করার জন্য। '৮৯-এর ঈদসংখ্যা (রোজা) বিচিত্রায় বিভাগীয় অধ্যাপক ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'ভদ্রলোকের উপনিবেশ' নামক একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। যদি ঐ প্রবন্ধটি দয়া করে বইতে সংযুক্ত করেন তবে কিশোর পরিণত নির্বিশেষে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট বইটা আরও বেশি গ্রহণযোগ্য হবে, এবং বাঙালী কিশোররা আরও সচেতন হয়ে উঠবে জাতীয়তা ও দেশ সম্পর্কে।

শ্রী সুশান্ত বর্মন (লায়ন)

১ম ধাপ, হাটির পাড়, কুড়িগ্রাম।

উফ্! কি ভয়ংকর! কি ভীতিপ্রদ! কেমন দুঃস্বপ্নের মতো আতংক জাগানো বই যে এটা হতে পারে তা প্রচ্ছদ দেখে ঠাহর করতে পারিনি। আমি শওকত হোসেনের 'উপদ্রব'-এর কথা বলছি। আপনার প্রকাশনীর কোন ভৌতিক কাহিনীই আমার গায়ের লোম খাড়া করতে পারেনি। কিন্তু উপন্যাস সিরিজের বই হয়ে 'উপদ্রব' তা পারল। কাজীদা, প্লিজ, বাতুলতা ভাববেন না। আমি সত্যিই অন্তরের অন্তস্তল থেকে শওকত ভাইকে আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

সেই কবে কোন এক রহস্যপত্রিকায় পড়েছিলাম যে নকশা নামে কি. থ্রি.-এর একটা বই আছে। সেটার খবর কি? আর কুয়াশা সিরিজ প্রথম থেকে, আমাদের (নতুন প্রজন্ম) জন্যে পুনর্মুদ্রণ করা যায় কিনা—একটু ভেবে দেখবেন।

রুণি

১০১ ঝিগাতলা, ঢাকা।

সেবা রোমান্টিকের 'নও শুধু ছবি' বই-এর ১০ পৃষ্ঠায় ডাঃ রুনার পরনে থাকে সালোয়ার কামিজ। কিন্তু ২২ পৃষ্ঠায় চা দিয়ে তার শাড়ি নষ্ট হয়। আমাদের তো জানা যে রুনা কোন রুমে যায়নি বা কাপড় পাল্টায়নি। তবে শাড়ি পরল কি করে, কখন ?

* নিশ্চয়ই এর জুতসই কোন জবাব আছে—লেখককে জিজ্ঞেস করে জানাবো। তবে আমার ধারণা, একটা উপন্যাসে যদি একবার কাপড় পাল্টে যায়, সেটা তেমন কোনও দোষের কিছু নয়। হিন্দী ছবিতে এক নাচেই নায়িকারা কাপড় পাল্টায় সাত বার।

সোয়েব ইসলাম

৬৮৭ পশ্চিম নাখাল পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।

'রোমাঞ্চগল্প-১' চমৎকার লেগেছে। আপনি কিন্তু কথা দিয়ে-ছিলেন ভাল লাগলে অন্তত আরও দু'টি রোমাঞ্চগল্পের সংকলন আমাদের উপহার দেবেন। সুতরাং ভাল যখন লেগেই গেল... কাজীদা, কুইক, প্লিজ।

* আসছে, আসছে।

শহিদুল

শ্রীরামপুর (কালিগঞ্জ), ডাকঃ নলডাঙ্গা, ঝিনাইদহ।

অনুবাদক বা লেখক হিসেবে আপনার, অথবা আপনার প্রকাশনা সংস্থা সেবা'র কোন জাতীয়-স্বীকৃতি নেই। আপনার বা সেবা প্রকা-শনীর জাতীয়-স্বীকৃতির ব্যাপারে আপনার আগ্রহ কতটুকু ?

* হয়তো বিরাট কোনও কাজ করছি না, কিন্তু যেটুকু করছি তার-চেয়ে হাজার গুণ বেশি স্বীকৃতি তো আমরা পেয়েই গেছি, ভাই—

পাঠকদের কাছ থেকে। অনেকের বই পয়সা পেলেও পড়বেন না, অথচ নিজের পয়সা খরচ করে সেবা'র বই কিনছেন ; এরচেয়ে বড় স্বীকৃতি ও সম্মান সেবা'র জন্যে কি হতে পারে ? এমন প্রাণঢালা ভালবাসা আর কারা পেয়েছে বলুন ? আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই।

মম হক
লালবাগ, ঢাকা।

আপনার নির্বাচিত রোমাঞ্চগল্প খু-ব ভালো লাগলো। রোবটের গল্প ভাল লাগে না আমার। তবুও বিজয়ের মনুষ্যত্ব পাওয়ার স্পৃহা হৃদয়কে স্পর্শ করে। পাঁচটি গল্পই ভিন্ন স্বাদের। আর গিন্নির কথা কি বলবো--তরিকুল্লার দুঃখে, হাসবো না কাঁদবো অবস্থা। দারুণ। আপনাকে এবং অন্যান্য লেখকদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ সুন্দর গল্পগুলির জন্যে। এমন বই আরো চাই।

মাহফুজুর রহমান (জুয়েল) ও তার আসমা আপা
পীরেরবাগ, মিরপুর ঢাকা-১২১০।

এইমাত্র খন্দকার মজহারুল করিমের সেবা রোমান্টিক 'অনুরূপা' পড়লাম। এক কথায় অপূর্ব। আমার মতে এটি সেবা'র শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক। লেখককে ধন্যবাদ।

ওহাব
৭২ নং এস. আই. রোড, নবীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

সপ্তম শ্রেণী থেকে সেবা'র সাথে পরিচয়। তখন বাড়ির সবাই সেবা-বিরোধী। তাই সেবা'র বই আমাকে লুকিয়ে পড়তে হতো। শিক্ষা জীবনের শেষ বর্ষে এসেও এর সংগে এক মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে রয়েছি। রানা, ওয়েস্টার্ন মোটামুটি সবই হজম করেছি ;

একাধিকবার। সেবা'র অন্যান্য বইয়ের সাথেও পরিচয় আছে। ওয়েস্টার্ন বইগুলি গতানুগতিক। রানা আগের সেই 'ইমেজ' নিয়ে দাঁড়াতে পারছে না। অবশ্য 'মুক্ত বিহঙ্গ' ভাল লেগেছে। মাইকেল সেভারসের চরিত্র তুলনাহীন। অ্যানিকে নিয়ে রানা ও মাইকেলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপভোগ্য হয়েছে। রাহেলা বানু ও অ্যানির কথোপকথনে রসবোধ রয়েছে। ভবিষ্যতে এমন বই আরও আশা করছি। সেবা'র রোমান্টিক উপন্যাসগুলো খুব একটা দাগ ফেলতে পারছে না। এদিকে একটু যত্ন নেবেন। কিশোর ক্লাসিকগুলো ভাল। নির্বাচিত রোমাঞ্চগল্প-১ মোটামুটি হয়েছে।

মিঠু ও টিউলিপ
এলিফেন্ট রোড, মগবাজার, ঢাকা।

আমরা সেবা'র ওয়েস্টার্ন ও মাসুদ রানার ভক্ত। আমরা আপনাদের প্রকাশনীর বই পড়ে খুব আনন্দ পাই। আজ থেকে ৭/৮ বৎসর পূর্বে আমরা এই প্রকাশনীর সাথে পরিচিত হই। আমাদের কাছে সেবা'র সব ওয়েস্টার্ন ও মাসুদ রানা বই আছে। আমরা প্রতি মাসে একটা করে রানা ও ৩/৪ টা ওয়েস্টার্ন কামনা করি। পরিশেষে আপনাকে, সেবা প্রকাশনীকে এবং সেবা'র লেখক ও ভক্তবৃন্দকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনো কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে পুস্তক সরবরাহ ব্যবস্থায় সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে শুধু মাসুদ রানা, ক্লাসিক বা শুধু অনুবাদের গ্রাহক হতে পারেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনা-মূল্যে ক্যাটালগের জন্যে সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

আগামী বই

আত্মোন্নয়নের একাদশতম বই

ব্যায়াম

রচনা : বিদ্যুৎ মিত্র

প্রকাশের তারিখ : ২৫-২-৯০

বিষয় : খেলোয়াড়, জিমন্যাস্ট বা বডি বিল্ডার হতে সাহায্য করবে না এ-বই আপনাকে। এতে রয়েছে শরীরটাকে ফিট রাখার জন্যে সবচেয়ে কম সময়ে কিভাবে কতটুকু কি করলেই যথেষ্ট।

অতিপ্রাকৃত, রোমাঞ্চকর, ভূতুড়ে গল্পের
অভিনব সংকলন

জামশেদ মুস্তফির হাড়

আবদুল হাই মিনার

"ত্রিলোচন হোড় কি কোন প্রেতসিদ্ধ পুরুষ? তান্ত্রিক? কাপালিক? ইহাকে দেখিলে একটা মামুলী মানুষই মনে হয়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কী এক দুর্জ্ঞেয় শক্তি যে ইহাকে চালনা করিতেছে তাহা শুধু অনুভবের ব্যাপার...।"

"কাকে যেন নিজ আস্তানায় ধরে এনেছে কুটি কবিরাজ। ক'দিন পরই কর্নেলের কাছে বেনামী চিঠি এলো, আর মাত্র বারো ঘণ্টা পরই খুন করা হবে কবিরাজকে। কিন্তু বারো ঘণ্টা পেরোতে না পেরোতেই..."

"পঁচিশ বছর ধরে জামশেদ মুস্তফির পেছন পেছন ছায়ার মতোন ঘুরে বেড়াচ্ছে কুটি কবিরাজ। কেন?"

বিভিন্ন স্বাদের নয়টি গল্প রয়েছে এ-সংকলনে। আপনার ভালো লাগবে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

বিশ টাকা